শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

বন্ধুবর

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

সূচী

মেবার-পতন

ফরাসডাঙার গোঁদলপাড়ার মল্লিক-বাড়ি সেকালে লোক-লস্কর, পূজা-পার্বণ, যাত্রা-মজলিস, গান-বাজনা, ডাকহাঁকে সর্বদা গমগম করিত। মেজোবাবু নিধু মল্লিক ভুঁড়ি দুলাইয়া যেদিন নূতন-বাজারে বাজার করিতে আসিতেন, সেদিন শেঠেদেরও হটিয়া যাইতে হইত। বাজারের সেরা মাছটা সেদিন হস্তান্তরিত হইবার উপায় ছিল না; খাস-চাকর রামধন সারা পথ ভারী মাছটা দড়ি ধরিয়া একরকম টানিতে টানিতেই লইয়া আসিত; তাহার মুখ দেখিলে মনে হইত, মাছ বহন করা দূরে থাকুক, সে হাতীর হাওদার উপর চড়িয়া বাড়ি আসিতেছে।

বড়কর্তা কান্তিবাবু বাহির-মহলে তাকিয়া ঠেসান দিয়া সটকা মুখে ঠায় বসিয়া থাকিতেন, লোকজন আসিত যাইত, একবারও চোখ তুলিয়া চাহিতেন না। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিত, পঞ্চাশ-বাতি ঝাড়টা জ্বালাইতে গিয়া ঝোলানো পরকলা-কাচে খানিকটা ঠুনঠুন বাজনা বাজিত, বড়গিন্নীর পেয়ারের চাকর হরিচরণ দুই হাতে দুইটি পিকদানের মত বড় বড় ধুনুচি লইয়া কি যেন বিড়বিড় করিতে করিতে ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইত, কান্তিবাবু একটা আরামের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিয়া ঘর-অন্ধকার-করা সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া দেখিতেন, চোখটা জ্বালা করিয়া উঠিলে সাধুকে একবার মাত্র হাঁক দিয়া আবার চোখ বুজিতেন। সাধু একটি শ্বেতপাথরের থালার উপর ধবধবে সাদা পাথরের গেলাসে পাঁড়েজীর তৈয়ারি পেস্তা-বাদাম-গোলমরিচ-মিশ্রিত ভাঙের শরবত লইয়া উপস্থিত হইয়া একবার কাশিত, বড়কর্তা চোখ বুজিয়াই বাঁ হাত বাড়াইয়া গেলাসটি তুলিয়া লইয়া এক চুমুকে পান করিতেন; সাধু গেলাসটি ধরিয়া তোয়ালে আগাইয়া দিত। ততক্ষণে ওস্তাদজী আসিয়া তাঁহার বাঁধা জায়গাটিতে বসিয়া তানপুরার তারে ঝঙ্কার তুলিতেন। গান-বাজনা চলিতে থাকিত, চারিদিক নিঝুম, বাতি সব নিবিয়া আসিল বলিয়া, বড়গিন্নী অন্দর ছাড়িয়া বারান্দায় আবছা আলোয় আসিয়া বসিতেন।

মুদিতনেত্র কান্তিবাবু যেন যাত্নবিদ্যার বলে তাহা টের পাইতেন, ঠিক সমের মুখে ওস্তাদজীকে বলিতেন, বহুৎ খুব। ওস্তাদজীও সে ইঙ্গিত বুঝিতেন।

কিন্তু সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। নিঃসন্তান কান্তিবাবুর মৃত্যুর পর দুই দিনের বেশি বড়গিন্নীর সবুর সহে নাই, তিনি যে কেমন করিয়া কি অসুখে স্বামীর সহগামিনী হইয়াছিলেন, সেদিন পর্যন্ত সে বিষয়ে সবিস্ময়ে আলোচনা চলিয়াছে। নিধু মল্লিকের তিন পুত্র মল্লিক-এস্টেটের মালিক হইয়া পরস্পর পাল্লা দিয়া পঞ্চ 'ম'কারের সাধনা ও সঙ্গে সঙ্গে মারামারি, মামলা করিয়া এক পুরুষের মধ্যেই সমস্ত সম্পত্তি নয়-ছয় করিয়া মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে। মেজোর দুই পুত্র, এক কন্যা এবং ছোটর তিন কন্যা বর্তমান; মল্লিকগুষ্ঠীতে কয়েক পুরুষ ধরিয়াই প্রথম সন্তানেরা নিঃসন্তান।

মেজো হরিরাম মল্লিকের কন্যা লক্ষ্মীই আমাদের এই গল্পের নায়িকা। কাকাবাবুর থিয়েটারের দলের জন্যই হউক, অথবা দাদাদের আদর্শ চোখের সম্মুখে থাকার জন্যও হইতে পারে, লক্ষ্মীর চরিত্রে দোষ স্পর্শ করিয়াছিল। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়াও তাহার চাল বদলায় নাই। বৎসরখানেকের মধ্যেই একদা প্রায় মধ্যরাত্রে কাছারি-বাড়িতে গোমস্তার নিকট সেদিনকার বাজারের হিসাব বুঝিয়া লইতে গিয়া সে স্বামী কর্তৃক তিরস্কৃত, প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া সেই যে বাপের বাড়িতে ফিরিয়াছিল, তিন বৎসর হইতে চলিয়াছে সেখানেই সে রহিয়া গিয়াছে। এখন তাহার বয়স আঠারো।

লক্ষ্মীর রূপ বর্ণনা করিতে হইবে! কালিদাসের হিমালয় ও দান্তের ইন্‌ফার্নো বর্ণনা পাঞ্চ করিয়া যদি কেহ লিখিতে পারিত, লক্ষ্মীর রূপের সে কিছু আভাস দিতে পারিত। নাক মুখ চোখ কান সবই তাহার মামুলি রকমেরই আছে, কিন্তু তাহার উপরেও এমন আর একটা কি বস্তু আছে—ঘাটে স্নান সারিয়া ভিজা মাটিতে পদচিহ্ন আঁকিতে আঁকিতে মোড়ল-পাড়ার মোড় ঘুরিয়া সে যখন বাড়ি ফিরিত, আরও অনেকে ফিরিত, কিন্তু সকলের দৃষ্টি ফিরিয়া ফিরিয়া শুধু তাহারই পশ্চাদনুসরণ করিয়া মরিত কেন? জবাব পাইত বলিয়া? মোটের উপর, গত তিন বৎসর ধরিয়া পাড়ার অনাত্মীয় প্রৌঢ় এবং তরুণদের মনে সে তুফানের সৃষ্টি করিয়াছিল, এতদিন যে লণ্ডভণ্ড কিছু ঘটিয়া যায় নাই, তাহার একমাত্র কারণ—

বিশ্বনাথ। গোঁদলপাড়ার পালচৌধুরীদের বাড়ির ছেলে। কলিকাতায় পড়ে। ভাল এবং মন্দে মিশিয়া এমন ছেলে আর হয় না। মন্দ বলিতেন প্রাচীনেরা, বিশ্বনাথের একটা দল ছিল বলিয়া। হরিশ মণ্ডল, যে কারণেই হউক, তাহার পুত্রবধূকে ঠেঙাইতেছে,

বিশ্বনাথের দলকে খবর দিলেই হইল—বাস্, আড়াই হাত নাকে খত দিয়াও হরিশকে সাত দিন গায়ের বেদনায় শয্যাশায়ী থাকিতে হইল। বেসরকারী চোলাই করা (illicit) প্রেম মনে মনে থাকিলেও গোঁদলপাড়ায় চলা কঠিন ছিল। হারাধন চাটুজ্জে একবার মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য একদা সন্ধ্যায় কোনও অসতর্ক মুহূর্তে যাদুমণি নাপতিনীকে লক্ষ্য করিয়া কাশিয়াছিলেন, বিশ্বনাথের দল কেমন করিয়া টের পাইল বিশ্বনাথই জানেন, হারাধন চাটুজ্জে সেদিন হইতে আর কাশেন নাই। মাঝরাত্রে নিজের ঘরে শয্যায় শুইয়া কাশি পাইলেও কাশি চাপিয়া গিয়া গৃহিণীকে বলিতেন, একবার দেখ তো গিন্নী, জানলাটা খুলে, ছোঁড়ারা কেউ কোথায়—

স্নান সারিয়া ভিজা মাটিতে পদচিহ্ন আঁকিতে আঁকিতে মোড়লপাড়ার মোড় ঘুরিয়া সে যখন বাড়ি ফিরিত

কিন্তু হইলে কি হয়, বারোয়ারিতে, থিয়েটারে, রোগীর সেবায় এবং শ্মশানযাত্রায় বিশ্বনাথের দল না হইলে এখন আর চলে না। দুঃস্থ নিরন্ন পরিবারকে অর্থসাহায্যও ইহারা গোপনে করিয়া আসিত। মোটের উপর, শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, ভয়ে, যে কারণেই হউক,

বিশ্বনাথকে ঘাঁটাইতে কেহ সাহস করিত না। সুতরাং সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও লক্ষ্মীকে লইয়া বেশিদূর অগ্রসর হইতে কেহ পারে নাই।

কিন্তু লক্ষ্মীর আর ভাল লাগে না। পূর্বপুরুষের কৃপায় তখনও ঘরে মা, মেয়ে এবং দুই পুত্রের অন্নসংস্থান ছিল। খাইয়া-দাইয়া, আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, বিদ্যাসুন্দর, কামিনীকুমার পড়িয়াও দিন কাটিতে চায় না। দাদাদের নাটকের রিহার্সালের দিন জানালার ফাঁক দিয়া বৈঠকখানা-ঘরের ভিতর নজর রাখিয়া রাখিয়া হৃদয় ও মন যখন চঞ্চল হইয়া উঠে, বাতায়নপথের আয়তন কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাড়িতে থাকে—হঠাৎ বিশ্বনাথের আগমনে সমস্ত চাঞ্চল্য স্থির, লক্ষ্মী পলাইয়া বাঁচে। এর ওর তার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিবার জন্য দাদা—কার্তিক গণেশ অনেক সময় চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ছাই আলাপ করিয়া হইবে কি, বিশুদা যদি ঘুণাক্ষরে টের পান—

লক্ষ্মী প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিল, আর নয়, অনেক সহ্য করিয়াছে সে। অন্যের সঙ্গে প্রেমের পথে বিশ্বনাথ যখন বাধার সৃষ্টি করিতেছে, অকারণে শক্তি ক্ষয় করিয়া লাভ নাই, একেবারে বিশ্বনাথকে লইয়াই পড়িবে সে, গোড়া লক্ষ্য করিয়াই কোপ মারিবে। দেখাই যাক, কে হারে, কে জেতে!

লক্ষ্মী-বিশ্বনাথ-প্রেম-মহাকাব্যের ইহাই হইল প্রস্তাবনা। কাব্য শুরু হইল।

মা কানে শুনিতে পান না, চোখও তাঁহার ক্রমশ খারাপ হইয়া আসিতেছে। কার্তিক গণেশ সারাটা দিন হৈ-হৈ করিয়া বেড়ায়। থিয়েটারের রিহার্সাল দেয়; রাত্রে মাঝে মাঝে বেতরিবতিও করে। বিশুদাকে বলিয়া দিবে বলিয়া লক্ষ্মী শাসায়।

বিশ্বনাথ কলিকাতা হইতে শনিবার সন্ধ্যায় আসে, সোমবার সকালে যায়। রবিবার ভোরবেলায় স্নান সারিয়া লক্ষ্মী সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকে; বই পড়িয়া অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করে, কিন্তু কোন বাণই ঠিক লক্ষ্যে গিয়া বিঁধে না, ফসকাইয়া যায়। লক্ষ্মী মরিয়া হইয়া উঠে। এক দিকে একাগ্রভাবে লক্ষ্য স্থির করিতে গিয়া লক্ষ্মী দিনে দিনে কঠিন হইতে থাকে, অন্য পক্ষে মদনের শরাসন হাতে যাহারা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া মুহুর্মুহু তীর নিক্ষেপ করে, তাহারা প্রতিহত হইয়া ফিরিতে বাধ্য হয়। লক্ষ্মীর কাছে এখন সমস্ত পৃথিবীতে বিশ্বনাথ একা পুরুষ, আর সে একা নারী।

বারোয়ারী দুর্গাপূজা উপলক্ষে 'মেবার-পতন' অভিনীত হইবে। লক্ষ্মীদের বৈঠক-খানায় রীতিমত রিহার্সাল চলিতেছে। বিশ্বনাথ অজয়ের পার্ট লইয়াছে, খেতু চাটুজ্জে মানসী। লক্ষ্মীর হাসিও আসে—রাগও হয়। খেতুদা আবার মানসীর পার্ট করিবে!

কার্তিকের বইখানা চাহিয়া লইয়া সে মানসীর পার্ট মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে, অজয়ের পার্টও সে প্রম্প্‌ট করিতে পারে।

বৈঠকখানা-ঘরের ভিতর অজয়-মানসীর রিহার্সাল চলে, অজয়ের অংশ কান পাতিয়া শুনিয়া সে মানসীর পার্ট নিজেই মনে মনে আওড়াইয়া যায়। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যেখানটায় মানসী বলে—"অজয় দেশান্তরে গিয়েছে। অজয়! চ'লে যাবার আগে একবার দেখাও ক'রে যেতে পার্তে। শুদ্ধ একখানি পত্রে—শুষ্ক ক্ষুদ্র পত্রে এ কথাটা না জানিয়ে, 'জন্মের মত বিদায়'টি এসে নিয়ে যেতে পার্তে। অজয়! অজয়! না, নিষ্ঠুর তুমি। না। তোমার জন্য আমি শোক কর্বো না।—চন্দ্রের জ্যোতি এত ক্ষীণ কেন? উদয় সাগরের বারিবক্ষ হঠাৎ এত ম্লান যে? প্রকৃতির মুখে সে হাসিটি কোথায় গেল?" মনে মনে ওই অংশ আবৃত্তি করিতে করিতে লক্ষ্মীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে, শোবার ঘরে ফিরিয়া শয্যায় উপুড় হইয়া শুইয়া সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে থাকে।

সেদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত রিহার্সাল চলিল, টুনু মিত্তির হেদায়েতের পার্ট কিছুতেই বাগে আনিতে পারিতেছিল না। খুব বিরক্তভাবেই শর্টকাট করিয়া বিশ্বনাথ বাড়ি ফিরিতেছিল। মল্লিক-বাড়ির ভূতপূর্ব বাগানের ভিতর দীঘির পাড় দিয়া পথ, বাগান এখন আগাছায় আগাছায় জঙ্গলে পরিণত। রাত্রি অন্ধকার, বিশ্বনাথ সেদিন টর্চটাও আনিতে ভুলিয়াছে। একটু অন্যমনস্কভাবেই সে চলিয়াছিল, হঠাৎ বাধা পাইল। কে? মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া লক্ষ্মীকে চিনিতে পারিয়া বিশ্বনাথের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

কে, লক্ষ্মী? এত রাত্রে এখানে?

অন্ধকারে লক্ষ্মীর হাসিটা বিশ্বনাথ দেখিতে পাইল না। সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্বনাথের ভাল লাগিল না। কেহ যদি জানিতে পারে, লক্ষ্মীরই ক্ষতি। একটু রূঢ় কণ্ঠেই বলিল, পথ ছাড়।

লক্ষ্মী নিরুত্তর।

লক্ষ্মী!

অকস্মাৎ অত্যন্ত তীব্র কণ্ঠে লক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, লক্ষ্মী নয়—মানসী। অজয়, অজয়!

বিশ্বনাথ ভয়ে তিন পা পিছাইয়া গেল। ক্ষেপিয়া গিয়াছে নাকি? পুকুরের জল লইয়া মাথায় দিবে? কার্তিক-গণেশকে ডাকিবে? লক্ষ্মী ততক্ষণে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার উষ্ণ নিশ্বাস গায়ে পড়িতেছে, তাহাকে ধরিল বলিয়া।

লক্ষ্মীটি, বাড়ি যাও। চল, তোমাকে মার কাছে পৌঁছে দিই।

তার দরকার নেই, আমার ওপর একটু দয়া কর বিশুদা, আমি অনেক দিন—

গোঁদলপাড়া ইয়ংমেন্‌স অ্যাসোশিয়েশনের সেক্রেটারি বিশ্বনাথ পালচৌধুরী হঠাৎ স্বমূর্তি ধারণ করিল, বলিল, চোপরও হারামজাদী।

যদি আমি চেঁচাই, যদি বলি, তোমাদের ভাল ছেলে বিশ্বনাথ আমাকে ভুলিয়ে—

টুঁটি টিপে মেরে তোমাকে পুকুরের পাঁকে পুঁতে দিয়ে যাব না!

তাই মার বিশুদা, একেবারে মেরে ফেল আমাকে, তোমার হাতে আমার ম'রেও সুখ। লক্ষ্মী বিশ্বনাথকে জড়াইয়া ধরিল।

চোপরও হারামজাদী

মর তা হ'লে।—বলিয়া বিশ্বনাথ একটা পাকা বিরাশি সিক্কা ওজনের নিদারুণ চড় লক্ষ্মীর গালে কষাইয়া পিছন ফিরিয়া না দেখিয়া দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করিল।

লক্ষ্মী কাঁদিল না, চেঁচাইল না, মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, উঠিয়া কোনও রকমে টলিতে টলিতে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

বাড়ি ফিরিয়া বিশ্বনাথ ভাবিতে বসিল; কথাটা প্রকাশ করিবে? কার্তিক-গণেশকে বলিবে? এ অবস্থায় মল্লিক-বাড়িতে রিহার্সাল দিতে আর যাওয়া চলে না। কিন্তু লক্ষ্মীর ভুলটা মুহূর্তের হইতে পারে। জানাজানি হইলে চিরজীবন শাস্তি পাইবে সে। বিশ্বনাথ কয়েক দিন চুপচাপ থাকিবে স্থির করিল, রিহার্সাল দিতেও যাইবে।

কি একটা কারণে কলেজ বন্ধ ছিল। পরদিনই রিহার্সাল। কিন্তু রিহার্সাল হইল না, গত রাত্রেই কার্তিক-গণেশের ভগিনী শ্রীমতী লক্ষ্মী নিরুদ্দেশ হইয়াছে। হৈ-হৈ, কান্নাকাটি। বিশ্বনাথ সকালেই খবর পাইল, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিল না। দলবল লইয়া অনুসন্ধান শুরু করিল।

চঞ্চলা-লক্ষ্মীর মতই লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইয়াছে, কোন সন্ধানই মিলিল না। 'মেবার-পতনে'র অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল।

চার বৎসর পর। লিলুয়ার লোকো অফিসার মিঃ বি. এন. পালচৌধুরীর দোতলা কোয়ার্টার্স; সামনের বাগানে লাল সুরকি দেওয়া রাস্তায় পেরাম্বুলেটার ঠেলিয়া একজন হিন্দুস্থানী আয়া ভিতরে শায়িত শিশুকে আদর করিতেছিল। দোতলার বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটি তরুণী শিশুর মুখভাব অতটা উঁচু হইতে লক্ষ্য করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। হঠাৎ কলকণ্ঠে ডাকিলেন, ওগো, দেখে যাও।

নাইট-গাউন-পরিহিত বিশ্বনাথ বারান্দায় আসিল। ঠিক সেই মুহূর্তে খেতু চাটুজ্জেকে গেট খুলিয়া বাগানের ভিতরে ঢুকিতে দেখা গেল। বিশ্বনাথ উপর হইতে চেঁচাইয়া উঠিল, এই যে মানসী!

তরুণী বারান্দা হইতে সরিয়া গেলেন।

'মানসী' নামটা উচ্চারণ করিয়াই বিশ্বনাথ কেমন থমকিয়া গেল, সেই রাত্রে লক্ষ্মীও 'মানসী' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছিল। এখনও তাহার সন্ধান নাই।

খেতু চাটুজ্জে নাট্যমহলে চাকুরি লইয়াছে। বিখ্যাত অভিনেত্রী মল্লিকার বেনিফিট নাইট, বিশুদাকে খেতু একটি বক্সের টিকিট গছাইতে আসিয়াছে। বিশ্বনাথ খেতুর উপরোধ এড়াইতে পারিল না। খেতুর বৃহৎ সংসার, কমিশন বাবদ যদি কিছু পায়!

কাজ সারিয়া নাট্যমহলে পৌঁছিতে একটু দেরি হইয়া গেল। প্লে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কলেজ-জীবনে থিয়েটারের ঘুণ ছিল বিশ্বনাথ, বেশ মন দিয়াই শুনিতে বসিল। পাশের চেয়ারে পত্নী নীরজা, তাঁহার একটা হাত তাহার কাঁধে আসিয়া পড়িয়াছে, পিছনে আয়ার কোলে ছেলে।

আশ্চর্য, সেই 'মেবার-পতন' অভিনয় হইতেছে। অভিনেত্রী মল্লিকাসুন্দরী মানসীর ভূমিকায় অপরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেই ঘন ঘন করতালিধ্বনিতে অডিটোরিয়াম ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। হাঁ, সুন্দরী বটে! কিন্তু মল্লিকার মুখখানা যেন কোথায় সে দেখিয়াছে, হয়তো কলেজ-জীবনে, তখন তাহার অত নাম হয় নাই, সখী সাজিয়া নাচিত বোধ হয়, কে জানে! বিশ্বনাথ একটু অন্যমনস্ক হইল।

প্রথম ড্রপ পড়িতেই খেতু আসিয়া তদারক করিয়া গেল। চা? শরবত? কিন্তু বিশ্বনাথ ভাবিতেছে। নীরজা বলিলেন, তোমার হ'ল কি? ভাল না লাগে তো চল, ফিরে যাই।

কিন্তু আয়া কোথায় গেল? খোকা তাহার কোলে। বিশ্বনাথ লাফাইয়া উঠিয়া স্যুইং ডোর ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না, বারান্দায় কে যেন মৃদু মৃদু কথা বলিতেছে, ছেলেকে আদর করার শব্দ। একটু আগাইয়া যাইতেই বিশ্বনাথ দেখিল, মল্লিকাসুন্দরী আয়ার কোল হইতে খোকাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে। মনটা হঠাৎ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে বক্সে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে বাহিরে পাঠাইয়া দিল। নিজের আসনে বসিয়া অভিনেত্রীর নিঃসঙ্গতা নিজের মনে অনুভব করিল। নীরজাকে বেশি দূর যাইতে হইল না, আয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, ড্রপ উঠিয়াছে।

বিশ্বনাথ আর কিছু দেখিতে শুনিতে পাইতেছিল না। নীরজা ও খোকার অস্তিত্বও ভুল হইয়া যাইতেছিল, বহুদিনবিস্মৃত সঙ্গীতের রেশের মত, কিন্তু ধরিয়াও ঠিক ধরা যাইতেছে না।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য। মানসী গাহিতেছিল—

"নিখিল জগৎ সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে,
অলস হৃদয় শিহরে তব কোমল কর পরশে।"

নাঃ, কোথায় কি যেন গোলযোগ ঘটিয়াছে, স্বামীর এই মূর্তি নীরজা কখনও দেখেন নাই, তবে কি—? তিনি বিশ্বনাথের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, বাড়ি চল, আমার ভাল লাগছে না।

বিশ্বনাথ আত্মবিস্মৃত মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল, একটু—

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নীরজা আয়াকে বাহিরে যাইতে বারণ করিলেন; বিশ্বনাথ নীরজাকে নিজের অ্যামেচার অভিনয়-কাহিনী শুনাইতেছিল, ওই সগরসিং—খেতু চাটুজ্জে—মানসী সাজিয়াছিল, আর সে অজয়; কিন্তু অভিনয় হয় নাই।

কেন?

আবার ড্রপ উঠিল।

তৃতীয় অঙ্কের শেষে খেতু চাটুজ্জে আসিয়া অভিনয় কেমন হইতেছে প্রশ্ন করিল, সগরসিংহের আর মানসীর? বিশ্বনাথ সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল, মল্লিকা কে বল তো? চিনি চিনি মনে হচ্ছে—

খেতু চাটুজ্জের লজ্জা হইল। পরে বলব।—বলিয়া সে চলিয়া গেল। মুখে যেন একটু হাসির আভাস।

বিশ্বনাথের সন্দেহ বাড়িল। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মানসীর সেই স্বগতোক্তি—"অজয়! অজয়! না, নিষ্ঠুর তুমি"—না, তাহার ভুল হয় নাই, মল্লিকবাগানের পুকুরপাড়ের সেই কণ্ঠস্বর "অজয়, অজয়!"

বিশ্বনাথ চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল, মানসী ততক্ষণে গান ধরিয়াছে—

"অলখিতে মুখে তার খেলে আলো জ্যোৎস্নার"

কিন্তু নীরজা বিশ্বনাথকে টানিয়া ধরিবার পূর্বেই সে পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!

লজ্জায় ঘৃণায় বিস্ময়ে নীরজা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। খোকা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল—থিয়েটারসুদ্ধ লোক প্রথমটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া পরক্ষণেই চীৎকার কোলাহল গালাগালি শুরু করিল, বেটা মাতালকে বের ক'রে দাও, পুলিস ডাক, মার শালাকে—

বিশ্বনাথের আকস্মিক প্রচণ্ড আবেগ ততক্ষণে শান্ত হইয়াছে, সেও কাঁপিতেছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িল।

রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী মল্লিকাসুন্দরী ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া গান থামাইয়াছে, বক্সের বাবুটি যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই 'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাও সে বুঝিয়াছে। ড্রপ পড়িতেই সে ভিতরে গিয়া খেতুর খোঁজ লইল। খেতু চাটুজ্জে ইতিমধ্যে উন্মাদের মত ছুটিতে ছুটিতে উপরে উঠিয়াছে। বিশ্বনাথের কাছে আসিয়া

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে প্রায় কাঁদিবার ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, সর্বনাশ বিশুদা, করলে কি ?
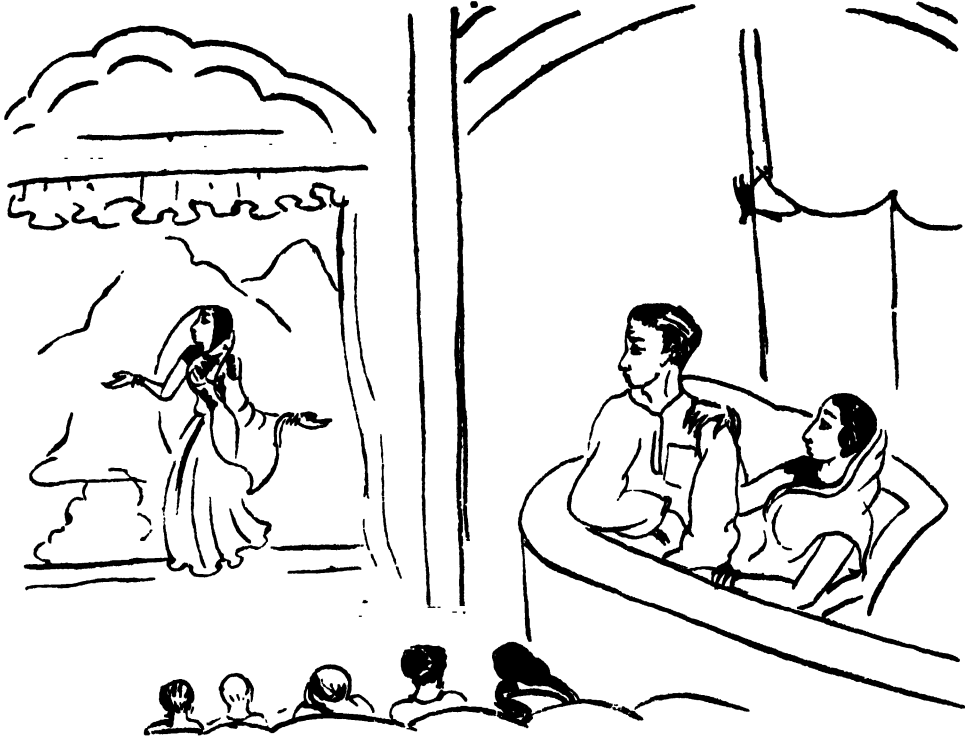
মল্লিকবাগানের পুকুরপাড়ের সেই কণ্ঠস্বর "অজয় ! অজয় !"

বিশ্বনাথ ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ও লক্ষ্মী নয় ?

তুমি কি পাগল হয়েছ বিশুদা ? কে লক্ষ্মী ?

বিশ্বনাথ সত্যই পাগলের মত হইয়াছিল, নীরজার সামনে সে এ করিল কি ? নীরজাকে সে বুঝাইবে কি করিয়া ? সে কি বিশ্বাস করিবে ? কিন্তু তখন আর ভাবিবার অবসর ছিল না, নীরজার দিকে না চাহিয়াই বলিল, বাড়ি চল।

অডিটোরিয়ামের চীৎকার তখনও থামে নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বিশ্বনাথ অনুভব করিল, লক্ষ্মী এতদিনে তাহার চড়ের কঠিন প্রতিশোধ লইল।

ড্রপ উঠিয়া আবার মানসীর গান শুরু হইতেই শ্রোতারা নীরব হইল। গান শেষ করিয়া মল্লিকা ভিতরে আসতেই খেতু চাটুজ্জে মুখ মুছিয়া ন্যাপা বোসের ভঙ্গিতে নাচিতে

নাচিতে তাহার কাছে আসিয়া তাহার থুতনিটা হাত দিয়া একটু নাড়িয়া দিয়া গাহিতে লাগিল,—

"এসেছিল বক্‌না গরু পরগোয়ালে জাব্‌না খেতে—"

মল্লিকা তাহাকে একটা ঠেলা মারিয়া বলিল, মরণ! রকম দেখ।

নায়েব মশাই

হরিহরপুর জানেন তো? গঙ্গা যেখানে হঠাৎ পূর্ব-দক্ষিণ মুখ ছাড়িয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া বাঁকের মুখে বিরাট চরের ভ্রূকুটি করিয়া পূর্ব-পশ্চিম-শায়িত পর্বতশ্রেণীর পাদদেশ স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব তীরের বাঁকের ঠিক পাড়ের উপর হরিহরপুরের কুঠিবাড়ি; স্টীমারে এপার ওপার করিবার সময় দূর হইতে কৃষ্ণচূড়াগাছের চূড়াটা দেখা যায়, তার পরেই সেই অতি পুরাতন পাঠান আমলের মসজিদটা। শীতের ঠিক শেষাশেষি যখন ঘটা করিয়া 'পছিয়া' বহিতে থাকে, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখের চরের সূক্ষ্ম বালুকণাগুলি উড়িয়া উড়িয়া আসে এবং সবুজ 'সয়াবিন'-ক্ষেতের উপর দিয়া অপূর্ব হিল্লোল তুলিয়া বাতাস বহিয়া যায়—

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা নয়, যিনি একবার হরিহরপুরে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি হয়তো এসব ভুলিবেন, কিন্তু কুঠির নায়েব মশাইকে ভোলা অসম্ভব। বেঁটে মোটা লোকটি, কদমছাঁট চুল, গোলআলুর মত গুড়গুড় করিয়া সকাল-সন্ধ্যা সারা গাঁটা চষিয়া বেড়াইতেছেন, দেখা হইলেই বিনীত নমস্কারে এবং কুশলপ্রশ্নে এক মুহূর্তে আপনার হৃদয় জয় করিয়া লইবেন। সকাল সাড়ে সাতটায় স্টীমার আসিয়া ঘাটে লাগে, নায়েব মশাই গলায় পাকানো ময়লা চাদরটি ঝুলাইয়া ঠিক ঘাটের মুখেই হাজির—অপরিচিত ভদ্রলোক দেখিলেই শত ওজর আপত্তি সত্ত্বেও একপ্রকার টানিতে টানিতেই কুঠিসংলগ্ন নিজের বাসাবাটিতে লইয়া যাইবেন; না যাইয়া উপায় নাই, হাতের ব্যাগ, পুঁটুলি অথবা শজিনাডাঁটার গোছাটা নায়েব মহাশয় ইতিপূর্বেই শক্ত হাতে ধরিয়া তুলিয়াছেন। আত্মীয় বা পরিচিত বাড়ির অজুহাতে কাজ হইবে না—আজ্ঞে, তাঁরা তো আছেনই, কিন্তু আগে গোলোক শর্মার উঠনে পদধূলি না দিয়ে—বসুধৈব কুটুম্বকম্, বুঝলেন কি না!

ইহার পর গোলোক শর্মাকে ভোলা অসম্ভব, এবং কেহ ভোলেও না। না ভোলার আর একটা কারণ এই যে, আপনি নেহাত কিছু তিন দিনেই হরিহরপুর ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না, এবং তিন দিনের উর্ধ্বকাল সেখানে থাকিলেই কুঠির নায়েব গোলোক শর্মার স্বরূপটি না দেখিয়া উপায় নাই।

স্থানীয় ডাক্তার প্রতাপবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ললিত আমার বাল্যবন্ধু; সাহেবগঞ্জের স্কুলের বোর্ডিঙে থাকিয়া একত্রে লেখাপড়া এবং বিড়ি ফুঁকিতে শিখিয়াছিলাম। ললিতের

কনিষ্ঠা ভগিনী ইন্দিরার শুভ-বিবাহ উপলক্ষেই আমার হরিহরপুর অভিযান। স্টীমার-ঘাটে যথারীতি নায়েব মশাইয়ের দর্শন লাভ করিলাম, কিন্তু ললিত আমাকে লইতে ঘাটে আসাতে গোলোক শর্মার উঠানে আর পদধূলি দিতে হইল না। কিন্তু লোকটিকে ভাল লাগিল।

কুঠির কর্তাদের পরেই ও-অঞ্চলে প্রতাপবাবুর প্রতিষ্ঠা। স্থানীয় লোকে তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকে। কলিযুগে তিনিই সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী অবতার—তাহাদের এইরূপই বিশ্বাস। ফলে চিকিৎসা ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারেও ডাক্তারবাবুকে মাথা দিতে হয়, সুতরাং তাঁহার বাড়ির উৎসব সমস্ত গ্রামের উৎসব, এবং নায়েব গোলোক শর্মা এই উৎসবের প্রধান অর্গ্যানাইজার।

বিনীত শান্ত নম্র জোড়হস্ত মূর্তিই গোলোক শর্মার পূর্ণ মূর্তি নয়, শয়তান প্রজারা এই রুদ্রের অদক্ষিণ মূর্তিকে বড় ভয় করে। জুতাইয়া জুতাইয়া অনেকেরই পিঠের চামড়া তিনি ছিঁড়িয়াছেন এবং গাঁট্টা মারিয়া মারিয়া তাঁহার হাতের গাঁটগুলি লোহার মত শক্ত হইয়া গিয়াছে। এই 'বসুধৈব কুটুম্ব' গোলোক শর্মার পূর্ণ পরিচয় ক্রমশ পাইতে লাগিলাম। সেই কথাই বলিতেছি।

ডাক্তারবাবু কুঠির বর্তমান মালিক জমিদার-বাবুদেরও গৃহ-চিকিৎসক, সুতরাং প্রকাণ্ড খালি কুঠিবাড়িটাই বরযাত্রীদের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট হইল। গৃহ-চিকিৎসক না হইলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ নায়েব গোলোক শর্মা যেকালে মাঝখানে আছেন। বস্তা বস্তা আলু, কুমড়া, লাউ, কপি আর কড়াইশুঁটিতে কুঠির একটা বারান্দাই ভর্তি হইয়া গেল, ইঁদুরগুলা একটু ছুটাছুটি করিবে, এমন ঠাঁইটুকু রহিল না। কুঠির প্রজারা ডাক্তারবাবুকে ভালবাসিয়া এসব সামগ্রী উপঢৌকন দিয়াছে, ইহাই হইল বাহিরের খবর; ভিতরের খবর শ্রীভগবান ও শ্রীগোলোক শর্মাই জানেন। দই, গুড় এবং মাছ যে কি পরিমাণ আসিবে তাহারও কানাঘুষা শোনা যাইতে লাগিল। কাছিমের মাংস হিন্দু-বিবাহে নেহাত চলে না, নহিলে এক দল কাছিমব্যবসায়ী নাকি শাসাইয়াছিল যে, তাহারা কাছিমের খোলা দিয়া কুঠিবাড়ির চৌহদ্দির মাটি ঢাকিয়া দিবে। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের কাছিম-সরবরাহের মূল কেন্দ্র হরিহরপুর, কথাটা বিশ্বাস না করিবার হেতু নাই। গোলোক শর্মা রাগিলে কাছিমগুলারও জালে ধরা না পড়িয়া উপায় নাই।

আয়োজনের ত্রুটি নাই, লোক-লস্কর সেপাই-শাস্ত্রী সব প্রস্তুত; কিন্তু হাওয়ার মুখে বরপক্ষের এবং যে স্থান হইতে তাহাদের আগমন, সেই স্থানের বরযাত্রী-মাহাত্ম্যের যে সকল টুকরা টুকরা খবর আসিতে লাগিল, তাহাতে নিরীহ ডাক্তারবাবুর ভড়কাইবারই কথা।

কবে কোথায় বরযাত্রীরূপে গিয়া উক্ত গ্রামের লোক কন্যাপক্ষকে শুধু নাকে খত দেওয়াতেই বাকি রাখিয়াছিল, কোথাকার খিড়কি-ঘাটে তাহাদের কয়জন পাড়ার মেয়েদের যৎকুৎসিত হেনস্থা করিয়াছিল—ললিত তো রাগিয়াই খুন 'এবং রাগিলে তাহার তোতলামি বাড়ে, বলিল, এখানে ওসব করলে জু-জু-জু-তিয়ে—

নায়েব মশাই তাঁহার খাটো ডান হাতটি বরাভয়ের ভঙ্গিতে ডান কান পর্যন্ত তুলিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া চোখ-মিটমিট করিতে করিতে বলিলেন, থামো না বাবাজী, তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন ? আমি তো এখনও মরি নি।—বলিতে বলিতে তাঁহার কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা গোঁফজোড়াটা নাচাইতে লাগিলেন। আমার হাসি পাইল। সিগারেট টানিবার জন্য ললিতকে লইয়া বাগানে গেলাম।

সকাল সাড়ে সাতটার স্টীমারে বরযাত্রীদের আসিবার কথা। রাত্রে মশাল জ্বালাইয়া কুঠিবাড়ির ঘরগুলি ধোওয়া হইল, নায়েব মশাইয়ের সে কি উৎসাহ! সঙ্গে সঙ্গে দুর্দান্ত বরযাত্রীরা কাল যে কি বেয়াড়াপনা করিবে, তাহা লইয়াও জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না, আমরা সত্য সত্যই একটু অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলাম।

সংখ্যায় তাঁহারা শতাবধি লোক আসিবেন, সব ছেলে-ছোকরার দল। প্রতাপবাবু গোলোকবাবুকে ইঙ্গিতে জানাইয়া রাখিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে সাহেবগঞ্জ হইতে দুই-এক বোতল যেন আনাইয়া রাখা হয়। তাহারা নাকি ডালের বদলে—

ললিত যত শোনে তত ক্ষেপে, তাহাকে সামলাইতে সামলাইতে অস্থির হইতে লাগিলাম।

কম্পিত পুলকিত চিত্তে সকালে ঘাটে হাজির হইলাম, দূরে বাঁশী বাজাইয়া স্টীমার আসিতেছে দেখা গেল এবং ঘাটে আসিয়া লাগিবার পূর্বেই বুঝিলাম, আজ কপালে দুঃখ আছে, দলটি সহজ নয়। আমাদিগকে ঘাটে দেখিয়া তাহারা যে ভাবে তারস্বরে 'শালা শালা' বলিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল, ললিত তো একতাল মাটি তুলিয়া লইয়া—। বহুকষ্টে তাহাকে নিরস্ত করিয়া সেই অসভ্য বর্বর চীৎকার শুনিতে হইল। ঘাটে নামিয়াই কয়েকজন বায়না ধরিলেন, পাল্কি চাই, নিতান্ত পাল্কি না হইলে শাম্পান*। প্রতাপবাবু ঘাটে আসেন নাই। নায়েব মশাই কন্যাকর্তা, তিনি গলবস্ত্রে বালি ও ধূলায় গড়াগড়ি দিতে শুধু বাকি রাখিলেন—এই তো এতটুকু পথ, সিনারি উপভোগ করতে করতে— বরঞ্চ একটু ক'রে চা দিই, জিরিয়ে নিয়ে—। বরযাত্রীর মধ্যে প্রবীণগোছের একজন ছিলেন; তিনি ছোকরাদের পক্ষে সায়

* মানুষে টানা গাড়ি, মণিহারীঘাট অঞ্চলে চলে।

দিয়া বলিলেন, এই তো একটা দিনের শখ ওদের, দিন না মশাই, মিটিয়ে। মনে হইল, ঘাটেই বুঝি একটা দাঙ্গা শুরু হয়। নায়েব মশাই যে কি কৌশলে শেষ পর্যন্ত অতগুলা এঁড়ে বাছুরকে কুঠির খোঁয়াড়ে পৌছাইয়া দিলেন, বুঝিতে পারিলাম না; তবে এইটুকু অনুভব হইল যে, আমাদের সেদিনকার ললাটলিপি ভাল নয়।

প্রথমেই হাঙ্গামা বাধিল চা লইয়া। লিপ্‌টনের শ্রেষ্ঠ ব্র্যাণ্ড চা—তাহারা ধুয়া তুলিল, আরে মশাই, এ যেন পাঁচন! কেহ বলিল, কপির ক্ষেত আছে বুঝি আপনাদের? বেশ তো কপিপাতা সেদ্ধ ক'রে এনেছেন!

খবর শুনিয়া প্রতাপবাবু তো প্রায় লাঠি লইয়া কুঠিবাড়ির দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন, গোলোক শর্মার বরাভয়-কর তাঁহাকেও নিরস্ত করিল।

কন্যাপক্ষের আমরা প্রায় কেহই সুস্থ ছিলাম না। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, নায়েব মশাই ক্ষেপিয়াছেন এবং গ্রামের হরিয়া গোয়ালাকে ধরিয়া কুঠিবাড়ির আঙিনায় আগাপাছতলা জুতাইতেছেন। কারণ কেহ বলিতে পারিল না।

সকলে কুঠিবাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটিলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া যে দৃশ্য চোখে পড়িল, তাহাতে হতভম্ব হইয়া গেলাম। ছয় ফুট তাগড়া জোয়ান হরিয়া ধূলায় পড়িয়া কাটা পাঁঠার মত ছটফট করিতেছে আর গড়াগড়ি দিতেছে, এবং স্খলিতকচ্ছ প্রায়-বিবস্ত্র নায়েব মশাই হিন্দী-বাংলা-মিশ্রিত অদ্ভুত অদ্ভুত গালি উচ্চারণ করিয়া লাফাইতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে হরিয়ার পিঠে চটিজুতা প্রহার করিতেছেন। তাঁহার কপাল দিয়া দরদরধারে ঘাম ছুটিতেছে এবং মুখে ফেনা ভাঙিতেছে। আমরা 'হাঁ হাঁ' করিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলাম। বিপরীত ফল হইল, তাঁহার লম্ফঝম্ফ বাড়িয়া গেল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, এতবড় আস্পর্ধা বেটা গয়লার, সকাল সাতটায় তোর পাঁচ সের দুধ দেবার কথা, তুই কিনা সাড়ে চার সের দুধ এনে বলিস—আর মিলল না হুজুর! এত বাড় বেড়েছে বেটা ছোটলোকের! গোলোক শর্মাকে চিনিস না? সেই আধ সের দুধের জন্যে তোকে মেরেই ফেলব, মেরে মাটিতে পুঁতব, তবে আমার নাম—

আমাদের বিস্ময়ের অবধি নাই, আধ সের দুধের জন্য এই কাণ্ড! দেখিলাম, বরযাত্রীরা সকলে বারান্দায় বাহির হইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করিতেছে। দুই-এক জনে ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ তুলিয়াছিল, কিন্তু গোলোকবাবুর রুদ্র মূর্তির সম্মুখে ভরসা করিয়া আগাইতে পারে নাই। তাহারা একরূপ বিস্মিত ও ভয়চকিত অবস্থায় পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিতে লাগিল।

দূরে প্রতাপবাবুকে হন্তদন্তভাবে ছুটিয়া আসিতে দেখা গেল। নায়েব মশাই দেখিলেন এবং দেখামাত্র তাঁহার আস্ফালন বাড়িয়া গেল।—বেটা, তুই পীরের কাছে এসেছিস মামদোবাজি করতে, উদয়াস্ত বাঘে' গরুতে যেখানে এক ঘাটে জল খায়, জানিস বেটা, কতগুলো মাথা ওই কেষ্টচূড়ো গাছের তলায় পোঁতা আছে? উনত্রিশ সালে এক দল বরযাত্রীকেই পুঁতেছিলাম ওখানে, মনে নেই?

মাঝে মাঝে হরিয়ার পিঠে চটিজুতা প্রহার করিতেছেন

প্রতাপবাবু আসিয়া পড়িয়াছেন, আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই গোলোক শর্মাকে ধরিতে গেলাম, কয়েকজন হরিয়াকে টানিয়া তুলিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলাম, হরিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ও লাফাইতে লাফাইতে 'ইয়া বাপ' 'আই বাপ' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। প্রতাপবাবু বলিলেন, সর্বনাশ, এ করেছ কি গোলোক? একটা খুনের দায়ে প'ড়ে কি শেষে বিয়েটাই পণ্ড করবে নাকি?

নায়েব মশাই গরম তেলে কাঁচা বেগুনের মত চড়বড় করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, একটা কি বলছেন ডাক্তারবাবু, দরকার হ'লে একশো একটা খুন করব, ফাঁসি তো হবেই—

বরযাত্রীদের অবস্থা তখন প্রায় কাহিল, ইতিপূর্বেই এক দল বরযাত্রী মারিয়া মাটিতে

পুঁতিয়া রাখার সংবাদ তাঁহারা শুনিয়াছেন, এখন আবার একশো এক খুন! সংখ্যায় তাঁহারাও তো ঠিক একশো এক জন।

প্রতাপবাবু বিবস্ত্রপ্রায় গোলোক শর্মাকে টানিতে টানিতে বাড়ির দিকে গেলেন এবং আমরাও হরিয়াকে লইয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। বরযাত্রীরা বেকুবের মত বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল।

মাঝপথে প্রতাপবাবু প্রশ্ন করিলেন, ক্ষেপে গেলে নাকি গোলোক? আত্মীয়-কুটুম্বের সামনে—

পরিশ্রান্ত ঘর্মাক্ত গোলোক শর্মার কাঁচা-পাকা গোঁফজোড়াটা আবার নাচিয়া উঠিল, চোখ-মিটমিট করিতে করিতে তিনি বলিলেন, রফায় হ'ল, এটা আর বুঝলেন না ডাক্তারবাবু? বেটা দু টাকায় রাজী হয়ে গেল। একটু দেখিয়ে দিলাম ওদের। দেখবেন, বাছাধনেরা আর টুঁ শব্দটি করবে না।

পিছনে মুখ ফিরাইয়া হরিয়াকে প্রশ্ন করিলেন, কি রে, বেশি হয়েছে নাকি?

হরিয়া এক গাল হাসিয়া জবাব দিল, না হুজুর, তেমন আর বেশি কি!

এতক্ষণে আমরা সত্য সত্যই বেকুব বনিয়া গেলাম। বলা বাহুল্য, ইন্দিরার বিবাহ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইল; এত শান্ত এবং শিষ্ট বরযাত্রীর দল সে অঞ্চলে নাকি ইতিপূর্বে আসে নাই। গোলোক শর্মার আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইয়া কন্যা লইয়া তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন। গোলোক শর্মার নটরাজ মূর্তির পরিচয় পাইয়া আমরাও চমৎকৃত হইলাম।

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস

হরিবিলাস রায়ের মনে বরাবরই একটা ক্ষোভ ছিল। ঢাকা ইন্টার্‌মিডিয়েট কলেজ হইতে আই. এ. পাস করিয়া তিন বৎসর হইল সে কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু এখনও সত্যকার reciprocal (পারস্পরিক) প্রেমে পড়া তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি. এ. পাস করিয়া ইউনিভার্সিটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ইংরেজীতে সে এম. এ পড়িতেছে, সেও প্রায় এক বৎসর হইয়া গেল। স্কটিশের সহপাঠিনীদের মধ্যে অন্তত তিন জন পুরা দুই বৎসর তাহার সহিত একত্র উঠা-বসা করিয়া তৃতীয় বৎসরেও একই সিঁড়ি দিয়া আশুতোষ বিল্ডিঙের তেতলা পর্যন্ত উঠা-নামা করিতেছে; তাহাদের মধ্যে অশোকা রাহাকে তাহার ভালই লাগে। সেও ইংরেজীতে এম. এ. পড়িতেছে বটে, কিন্তু প্রেমে পড়ার কোনও লক্ষণই তাহাতে দেখা যাইতেছে না। ঢাকা হইতে যখন কলিকাতায় বি. এ. পড়িতে আসার কথা হয়, তখন হইতেই হরিবিলাস মনে মনে কত স্বপ্নই না দেখিয়াছে—ইডেন গার্ডেন, উট্‌রাম ঘাট, লেক, বালিগঞ্জ, ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন, বেথুন কলেজ, স্কটিশ চার্চ, হেদুয়া। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা—ইডেন গার্ডেনে ভূতপূর্ব ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডের সামনের বেঞ্চগুলিতে স্তিমিতপ্রদোষে মাড়োয়ারীরা আজানু কাপড় তুলিয়া কণ্ডুয়নপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে দেখা যায়; উট্‌রাম ঘাটের জেটির পাটাতনে জোড়ায় জোড়ায় যাহারা ঘোরে, তাহাদিগকে অস্পষ্ট সন্ধ্যায় ভাগীরথীজলকল্লোলের মধ্যেও বহুদিনের স্বপ্নবাঞ্ছিত নায়িকা বলিয়া ভুল হয় না; লেকের ভিড়ে দম বন্ধ হইয়া আসে; বালিগঞ্জের পথে দুই দিন হাঁটিয়াই তাহার ডিস্পেপ্‌সিয়া ধরিবার উপক্রম করে; হেদুয়ার জলে পড়িয়া সাঁতার কাটিতে ইচ্ছা হয়। প্রেমে পড়া আর হইয়া উঠে না, অথচ কাব্যমার্গে হরিবিলাস তখন ধাপে ধাপে আগাইয়া চলিয়াছে। টেনিসন হইতে কীট্‌স, কীট্‌স হইতে শেলী, শেলী হইতে বায়রন, বায়রন হইতে ক্রিশ্চিনা রসেটি, ক্রিশ্চিনা রসেটি হইতে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং। কবিতা লেখার বাতিক তাহার ছিল না, থাকিলে দুই বৎসরে সে অন্তত দুই রীম কাগজ ভরাইয়া ফেলিত। কিন্তু হরিবিলাসের দুঃখের অন্ত নাই। এক একবাব তাহার মনে হয়, দূর হোকগে ছাই, মরতে এই কলকাতায় এলাম, মেসের হলুদ-ঝোল, আর কুঁচো-চিংড়ি খেয়ে খেয়ে প্রাণ যায় যায়! এর চাইতে বুড়ীগঙ্গার স্নিগ্ধ কোল, সেই ইলিশ আর চাঁই, মাগুর আর কই—ভাবিতে ভাবিতে হরিবিলাসের বালিশ ভিজিয়া যায়। পুরানো পল্টনে

মামার বাড়িতে সে মানুষ ; বাবা ছিলেন ময়মনসিংহের সদরালা, সম্প্রতি দিনাজপুরে বদলি হইয়াছেন। বিমাতা সঙ্গে আছেন, তৎসত্ত্বেও হরিবিলাস ভাবিল, একবার দিনাজপুর হইয়া দার্জিলিং ঘুরিয়া আসিবে, এ একঘেয়ে জীবন তাহার আর ভাল লাগিতেছে না।

হরিবিলাস ক্লাসের সেরা ছেলে, বিশেষ করিয়া ইংলিশ পোয়েট্রিতে তাহার সঙ্গে কথা বলিতে জয়গোপাল বাঁড়ুজ্জে পর্যন্ত ভয় পান। তাহার উদাসীন-ভাব সহপাঠীদের দৃষ্টি এড়াইল না। সকলে শুনিল, হরিবিলাস 'মেঘদূত' পড়িবার জন্য

একই সিঁড়ি দিয়া আশুতোষ বিল্ডিঙের তেতলা পর্যন্ত উঠা-নামা করিতেছে

দার্জিলিং যাইতেছে। তখন সেপ্টেম্বর মাস ; ধূসর আকাশ মাঝে মাঝে গাঢ় নীল হইয়া দেখা দিতেছে। কচি রোদে কাঁচা সোনার রঙ ধরিয়াছে।

সকালে হরিবিলাস হোল্ড-অলে খানকয়েক কাপড় ভরিতেছিল, হঠাৎ সুধীরের আবির্ভাব। ভূমিকা না করিয়াই সুধীর বলিল, বাঁচালে ভাই, কি ফ্যাসাদেই পড়েছিলাম! টেলিগ্রাম পেয়ে হঠাৎ মাসীমাকে রংপুর যেতে হচ্ছে, আমাকেই ধরেছেন নিয়ে যেতে। আমার এদিকে জরুরি এন্‌গেজ্‌মেন্ট। তুমি যাচ্ছ ভাই, পার্বতীপুর পর্যন্ত একটু কষ্ট ক'রে যদি মাসীমাদের নিয়ে যাও—

হরিবিলাস এতক্ষণ হাঁ করিয়া সুধীরের কথা শুনিয়া যাইতেছিল। আর থাকিতে পারিল না। বলিল, মাসীমাদের?

হ্যাঁ হ্যাঁ। মাসীমা আর মীনা—আমার মাসতুতো বোন, লাভ্‌লি কম্প্যানিয়ন, আশুতোষ কলেজ থার্ড ইয়ার—কিচ্ছু অসুবিধা হবে না ভাই, মীনা খুব চটপটে, নিজেই—

হরিবিলাস সুধীরকে আর কথা বলিতে দিল না। কলিকাতার তিন বৎসরের জীবনে তৃষ্ণার্ত চাতকের মত যে জলবিন্দুর প্রতীক্ষা সে ব্যাকুল আগ্রহে করিতেছিল, এতদিনে কি তাহার সন্ধান মিলিল? সে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা আচ্ছা, স্টেশনে একটু আগে যেও কিন্তু।

সুতরাং সেদিন শিয়ালদহ স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে—সুধীর মাসীমা ও মাসতুতো বোনকে লইয়া একটু আগেই আসিয়াছিল। লাগেজ বিশেষ কিছু ছিল না। গাড়ি প্ল্যাটফর্মে 'ইন' করিতেই সুধীর ও হরিবিলাস ধরাধরি করিয়া মাসীমা ও মীনাকে ইণ্টার ক্লাসে মেয়েদের গাড়িতে উঠাইয়া দিল। পাশের কামরায় নিজের মালপত্র চাপাইয়া বিছানাটা বাঙ্কের উপর একটু আলগা করিয়া হরিবিলাস সুধীরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাসীমাকে আগেই প্রণাম করা হইয়াছিল, সুধীর মীনার সঙ্গে হরিবিলাসের আলাপ করাইয়া দিল।

পর পর তিনটা জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঠ-ফাটা রোদে যে খড়ের গাদা শুকাইয়া হু-হু করিতেছিল, তাহাতে একটি প্রজ্জ্বলিত দেশলাইয়ের কাঠি নিক্ষেপ করিল সুধীর। নিমেষমধ্যে দাউ দাউ করিয়া আগুন ধরিয়া উঠিল, গোটা শিয়ালদহ স্টেশনটা দুলিতে শুরু করিল, বিরাটকায় লৌহ-সরীসৃপ নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস বাঁকিয়া ধনুকের মত হইয়া গেল—ফুলধনু! সেই ধনুকের বাতায়ন হইতে মনসিজ মীনার মারফৎ নয়নরূপ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হরিবিলাস এক নিমেষে বিলকুল মরিয়া গেল।

মীনা জানালার ধারেই বসিয়া ছিল। ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, আপনার নাম শুনেছিলাম সুধীরদার কাছে, আজ দেখলুম। আপনি তো শুনেছি একটা বিদ্যের জাহাজ।

হরিবিলাস আগেই মরিয়াছিল। ভূতের মত জবাব দিল, শুনবেন না সুধীরের কথা ; মিথ্যের চুপড়ি ওটা।

প্রথম আলাপের অস্বাভাবিকতা অনেকটা সহজ হইল। বলিল, গরম লাগছে আপনার, লেমনেড খাবেন ?

মীনা 'না' বলিল না। মৃত হরিবিলাসের স্কন্ধে তখন যেন জুনিয়ার ডাগ্‌লাসের প্রেতাত্মা ভর করিল, এদিকে ছোটে, ওদিকে ছোটে—লেমনেডের গ্লাসটা মীনার হাতে আগাইয়া দেয়। এলিজাবেথ ব্যারেটের কথা মনে পড়ে। খোঁড়া নয় তো ?

দূরে সবুজ আলো, খানিকক্ষণের জন্য বিগড়াইয়া যায় না ওই কলটা ? সুধীর হরিবিলাসের কাঁধ ধরিয়া ঠেলিয়া দেয়, হাতল ধরিয়া সে ঝুঁকিয়া দাঁড়ায়। মীনা ঘাড় বাঁকাইয়া দেখে। ট্রেন ছাড়িয়া দেয়।

সুধীর হাঁকিয়া বলে, দেখো, গাড়িতে সুইন্‌বার্ন খুলে ব'সো না যেন, একটু খোঁজখবর নিও।

সুইন্‌বার্ন, প্রসার্‌পিনা। হরিবিলাস জীবনে কখনও গান গায় নাই। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের দরজায় ভর দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হরিবিলাসের মনে গান জাগিল।

মীনাকে দেখা যায় না, তাহার ছায়াটা সবুজ ঘাসের উপর ছুটিয়া চলে, তাহার বসিবার ভঙ্গিটা শুধু অনুভূত হয়—অসাধারণ !

দি লাস্ট রাইড টুগেদার—রাণাঘাট। মীনার মা ছানার জিলিপি কেনেন এক চেঙড়া, হরিবিলাস অবাক হইয়া দেখে। মায়ের কাছে ইশারা পাইয়া সম্ভবত মীনা একটু কৌতুকের হাসি হাসিয়া পাঞ্জাবির হাত-গুটানো হরিবিলাসকে ডাকে, রাত এখনও বেশি হয় নি, আসুন না, দুটো জিলিপি খেয়ে এক গেলাস জল খাবেন।

ব্রাউনিঙের কল্পনার বাহিরে ছিল এটা, তিনি শুধু ভাবিয়াছিলেন—

Might she have loved me? Just as well
She might have hated, who can tell!

ঘৃণা ভালবাসার কথা নয়, জিলিপি—তাও আবার ছানার। হরিবিলাস লাফাইয়া গাড়িতে উঠে, একটি কামরায় মীনা আর তাহার মা, অন্য যাত্রী নাই।

তাড়াতাড়িতে কামড় দিতে গিয়া জিলিপির রস গড়াইয়া সর্বাঙ্গে পড়ে, মীনার সে কি হাসি

ঐ যা !

ট্রেন ছাড়িয়া দেয়, ভয় এবং আনন্দ মিশ্রিত এক অদ্ভুত অনুভূতি ; রসাতলে যাক টিকিট-চেকার, রসাতলে যাক পৃথিবী—দি লাস্ট-রাইড টুগেদার।

জিলিপির রস গড়াইয়া সর্বাঙ্গে পড়ে

মা আপাদমস্তক চাদর মুড়িয়া শুইয়া পড়েন। ঝড়ের বেগে ট্রেন চলে।

জীবনের একুশটা বৎসর যাহার সহিত দেখা হয় নাই, অথচ যাহাকে কামনা করিয়া জন্ম-জন্মান্তরের দীর্ঘ পথ বাহিয়া আসিয়াছে সে, দুই ঘণ্টার কথাবার্তা তাহার সহিত নিমেষের পরিচয় মাত্র ! ইউনিভার্সিটি প্রোজ সিলেক্‌শন্‌স দিয়া কথা শুরু, টেনিসনের "Come into the Garden Maud" পর্যন্ত যে কি করিয়া কথা অগ্রসর হয়—

পোড়াদহ পার হইয়া যায়, নামা হয় না। মীনা কথা বলিতে বলিতে ঢুলিতেছে, তাহাকে ওই অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া সে নামিবে কেমন করিয়া ! মীনা ঘুমাইয়া পড়ে, ধীরে ধীরে হরিবিলাসের দেহও অবশ হইয়া আসে।

হরিবিলাসের যখন ঘুম ভাঙিল, ট্রেন তখন শান্তাহারের রেল-ইয়ার্ড অতিক্রম করিতেছে, ঝকঝক ঘটাঘট শব্দ, শিয়রে অত্যুগ্র বৈদ্যুতিক আলো ঝড়ের বেগে পার হইয়া যাইতেছে। তাহার ঘুম ভাঙিল এক মেমসাহেবের হট্টগোলে। শান্তাহারের কোনও রেলকর্মচারীর পত্নী হইবেন। মেয়েদের গাড়িতে পুরুষ দেখিয়া তিনি তো প্রায় শিকল টানিতে যান। নিদারুণ ভয়ের মধ্যেও হরিবিলাস শুনিল, মীনা বিশুদ্ধ ইংরেজীতে মেমসাহেবের সহিত তর্ক জুড়িয়াছে; তাহার দেহে পুলকসঞ্চার হইল, সে ঘাপটি মারিয়া পড়িয়া রহিল। মীনা বুঝাইয়া দিল, ছেলেটা ডাকাত নয়, তাহারই ভাই, খাবার খাইতে আসিয়াছিল, আর নামিতে পারে নাই। তাহাদের মা সঙ্গে আছেন, মেমসাহেবের আশঙ্কার কারণ নাই।

মেমসাহেব গজগজ করিতে করিতে মীনার পাশেই বসিলেন। স্ত্রীলোক, অনতিবিলম্বে শান্তাহারে চাল-ডাল দুধ-ঘিয়ের অসম্ভব দামের কথা উঠিল। হরিবিলাস আড়চোখে মীনাকে দেখিতে লাগিল।

কিন্তু অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয় নাই—প্রাণটা আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছে। পাঁড় সিগারেটখোর সে। সিগারেটের প্যাকেটটা ইতিপূর্বে পাশের কামরায় মনে মনে কাব্যচর্চা করিতে করিতে ধোঁয়া হইয়া গিয়াছে। হরিবিলাস ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল এবং ভূমিকামাত্র না করিয়া মেমসাহেবের কাছে অ্যাপলজি চাহিল। মেমসাহেব তখন বাবুর্চির মাংস-চুরির ইতিহাস সরসভাবে বর্ণনা করিতেছিলেন, একটু হাসিলেন মাত্র।

হিলি—অন্ধকার ফিকা হইয়া আসিতেছে। শীতের জড়তা। প্ল্যাটফর্মে লোক নাই। হরিবিলাস ছুটিতে ছুটিতে স্টলের কাছে গেল, একটা লোক চাদর মুড়ি দিয়া টেবিলের উপর ঘুমাইতেছিল। তাহাকে নাড়া দিয়া প্রশ্ন করিল, সিগারেট আছে? লোকটা বিরক্তভাবে উঠিয়া বসিল, পাশেই একটা ছোট আলমারির মত ছিল, সেটা খুলিয়া পাসিং শো সিগারেটের একটা প্যাকেট বাহির করিল। দুইটি মাত্র সিগারেট ছিল—দুই পয়সা। হরিবিলাসের কাছে আধুলির নীচে কোন মুদ্রা ছিল না।

চেঞ্জ নাই। মীনা মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছে। নিরুপায় হরিবিলাস প্ল্যাটফর্মের ওধারটায় একবার চেষ্টা দেখিতে গেল। কিন্তু মাঝ রাস্তা অতিক্রম না করিতেই দেখা গেল, হঠাৎ হুইস্‌ল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মীনা প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, ট্রেনে চাপার কথা ভুলিয়া হরিবিলাস সেই মধুর কণ্ঠের অস্ফুট আর্তনাদ কান পাতিয়া শুনিল, মীনা তাহার জন্য ভয় পাইয়াছে নিশ্চয়ই।

এ অপর্চুনিটি মিস করা নয়, ছুটিয়া যেখানে হউক উঠিতেই হইবে, ছুটিতে ছুটিতে একটা হাতলে হাত লাগিল, পিতলের। হরিবিলাস হাতল ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু লোক নাই। হাতল ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকাটা নিরাপদ নয়। জানালার সার্শি খোলা ছিল। হাত বাড়াইয়া দরজার ক্যাচ খুলিয়া হরিবিলাস ভিতরে প্রবেশ করিল। হ্যাঙ্গারে একটি কোট ঝুলিতেছে। একটা চামড়ার হাতব্যাগ খোলা পড়িয়া আছে। গোল্ডফ্লেক সিগারেটের একটা টাটকা টিন, দেশলাইও এক বাক্স। সাহেব নিশ্চয়ই ল্যাভেটরিতে ঢুকিয়াছেন।

সত্যজাগ্রত প্রেম ও ধূম্রপানবাসনা ভাল মানুষ হরিবিলাসকে মরিয়া করিয়া তুলিয়াছে। এক রাত্রিতে অনেক অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করিয়াছে। একটা সিগারেট চুরি করিলে বিশেষ দোষ হইবে না। কৌটা খুলিয়া একটি সিগারেট বাহির করিতে বেশি সময় লাগিল না। তিনবার ঠুকিয়া সেটি সে পরিপাটি করিয়া ধরাইল এবং 'আঃ' বলিয়া বাহিরের আকাশ লক্ষ্য করিয়া ধোঁয়া ছাড়িল। আরাম ইহাকেই বলে। গলা বাড়াইয়া হরিবিলাস মীনাকে দেখিবার চেষ্টা করিল—কিছুই দেখা যায় না।

হাতল ঘুরিবার শব্দ হইল, সাহেবকে একটা জবাবদিহি করিতে হইবে। বাহিরে মুখ রাখিয়া হরিবিলাস জবাবটা মনে মনে ঠিক করিতে লাগিল। মুখ ফিরাইতেই—

বিলাস, তুই এখানে ?

সর্বনাশ, বাবা! হরিবিলাসের মনে হইল, অকস্মাৎ ভূমিকম্পে ট্রেনখানা থামিয়া গিয়াছে এবং সে দ্বিধাবিভক্ত ধরণীর অভ্যন্তরে প্রজ্বলন্ত সিগারেট হাতে ধীরে ধীরে নামিতেছে। সিগারেট সে ফেলিয়া দিল এবং হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবাকে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া ফেলিল। কি বলিতে যাইতেছিল, পার্বতীপুরে আসিয়া ট্রেন থামিল।

কথা বলা হইল না, বাবা তাড়াতাড়ি ব্যাগ হাতে প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পুত্রকে বলিলেন, আমার সঙ্গে এস।

এ কামরা, এ কামরা—এই যে এস মা, নেমে পড়।

ব্রাউনিং ঘুলাইয়া গেল। হরিবিলাস কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। বাবা মীনাকে নামিতে বলিতেছেন, মীনার মা ঘোমটা টানিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছেন। মেমসাহেব মীনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—Here's your brother (এই যে তোমার ভাই)।

ব্রাদার! হরিবিলাসের বাবা তাহার দিকে একবার চাহিলেন মাত্র, তাহার সর্বাঙ্গ যেন সেই চাহনির আঘাতে হিম হইয়া গেল।

পিতৃবন্ধুর কন্যা মীনা, তাহার পিতার আহ্বানেই মেয়েকে দেখাইতে মীনার মা রংপুরে পিত্রালয়ে চলিয়াছেন। সেখানে হরিবিলাসের পিতা পাত্রী-আশীর্বাদ করিবেন।

হরিবিলাস কাব্যমার্গে সুইন্‌বার্ন পর্যন্ত অগ্রসর হইলেও এতখানি কল্পনা করিতে পারে নাই। তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে পিতার যে একজন সকন্যা বন্ধু থাকিতে পারে, ততখানি তারুণ্য সে স্বভাবতই পিতার উপর আরোপ করে নাই। কিন্তু যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছিল। পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া কোনও পিতাই আপনার বন্ধুত্ব নিয়ন্ত্রণ করেন না; হরিবিলাসের পিতাও করেন নাই।

সুতরাং পার্বতীপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুভদৃষ্টি হইয়া গেল। লাস্ট রাইড টুগেদারই বটে। কৌমার্য-জীবনের শেষ যাত্রা।

রাণাঘাটের ছানার জিলিপি হরিবিলাসের জীবনে অক্ষয় হইয়া রহিল।

শিকারী

ভোলাহাটের জমিদারবংশ অতি প্রাচীন, একেবারে পাঠান আমলের বুনিয়াদ তাঁহাদের। সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে রাণী ভবানীকে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছিলেন, ইঁহাদের পূর্বপুরুষ তাঁহাদের একজন। বর্তমানে রাজা মহিমনারায়ণ মহাসমারোহে রাজত্ব করিতেছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, তথাপি সোজা আছেন। সেদিন তাঁহার জমিদারির স্বর্ণজুবিলী হইয়া গেল। একমাত্র পুত্র বালকনারায়ণ পিতার দোর্দণ্ড প্রতাপের মুখে শিশুই রহিয়া গেলেন। বয়স ষাট অতিক্রম করিয়াছে তবুও কুমার বাহাদুর—চিররুগ্ন, গেলেন গেলেন করিয়া কোনক্রমে টিকিয়া আছেন। পিতা মহিমনারায়ণের হালচাল দেখিয়া তিনি হাল ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত আছেন, রাজত্ব করিবার সৌভাগ্য এ জীবনে তাঁহার হইবে না। এ এক রকম ভাল। কিন্তু তাঁহার পুত্র ধূর্জটিনারায়ণ ক্ষেপিয়া আছেন, তাঁহার বয়সও চল্লিশ অতিক্রম করিয়াছে, জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য পাত্র সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। মোগল আমল হইলে বুড়া মহিমনারায়ণকে মারিয়া অথবা পুরাতন গুমঘরে বন্দী করিয়া রাজত্ব করার শখটা তিনি মিটাইয়া লইতেন, কিন্তু তাহা হইবার নহে। বাবার জন্য কোনও চিন্তা নাই, রুগ্ন শিখণ্ডী মাথায় মুকুট পরিয়া সামনে খাড়া থাকিলেই বা ক্ষতি কি?

কিন্তু বুড়া জবরদস্ত, নাতির বেচাল দেখিয়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভাতা বাড়াইতে প্রস্তুত নন। ধূর্জটিনারায়ণ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। শিকার আর শখের থিয়েটার লইয়া এ যুগের একটা মানুষ কতদিন কাটাইতে পারে? একটা সিনেমা কোম্পানি খুলিবার সখ ছিল। পরিচিত তারকা-অভিনেত্রীও দুই চারি জন রাজী ছিল, কিন্তু ম্যানেজারের জবানিতে বুড়া সাংঘাতিক রকম দাঁত খিঁচাইয়াছেন। ম্যানেজারের দাঁত ভাঙিয়া সে রাগ যাইবার হইলে ধূর্জটিনারায়ণ তাহাই করিতেন, তিনি রাগ করিয়া সদলবলে কাশ্মীর গেলেন।

তাহার পরেই বাংলা সাহিত্যে শিকারী ধূর্জটিনারায়ণের আবির্ভাব। বারো ফুট দুইটি সদ্যমৃত রয়াল বেঙ্গল টাইগারের পেটের উপর পা দিয়া শিকারীবেশে ধূর্জটিনারায়ণের ফোটো দেখিয়া এবং সঙ্গে তল্লিখিত বিচিত্র শিকারকাহিনী পড়িয়া দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টার আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। সংবাদ পাওয়া গেল, আসামের জঙ্গলে হাতী, বাঘ এবং বন্য মহিষ শিকার করিয়া কুমার ধূর্জটিনারায়ণ কলিকাতার গ্রেট ইম্পীরিয়াল হোটেলে অবস্থান করিতেছেন।

সম্পাদকের হুকুম পাইয়া পত্রদ্বারা একটা ইণ্টার্ভিউয়ের বন্দোবস্ত করিলাম এবং কুমার বাহাত্বরের প্রাইভেট সেক্রেটারির নির্দেশমত একদা সন্ধ্যায় যতদূর সম্ভব ফিটফাট হইয়া বিনীতভাবে গ্রেট ইম্পীরিয়াল হোটেলে দর্শন দিলাম। হোটেলের তিনটি কামরা লইয়া কুমার বাহাত্বর তখন সেখানে অবস্থান করিতেছেন; ইয়া ইয়া ফরসি, গড়গড়া, পাঁচ সাতটা খিদমৎগার—একেবারে আমিরী ব্যাপাব! বারান্দায় নামানো সোডার বোতলের সংখ্যা গণিয়া আরও কিছু আন্দাজ করিতে হইল। সেক্রেটারি ভূতনাথ বিশ্বাস বিনীতভাবে আমাকে লইয়া বসিবার ঘরে বসাইল এবং কুমার বাহাত্বরের গোসলখানা গমনের বার্তা নিবেদন করিয়া অন্তর্ধান হইল। চারিদিকে সোফা আর সেটি—দামী কার্পেটের উপর একটা গোল টেবিল, তাহার উপর কাশ্মীরী জাজিম পাতা এবং তাহারও উপর অর্ধ-উন্মুক্ত এক সংখ্যা 'লণ্ডন লাইফে'র পাতায় একটি বৈদেশিকী নগ্ন নর্তকীমূর্তি। কাচের আলমারির দিকে দৃষ্টি না পড়িয়াও মনটা ভিজিয়া আসিয়াছিল। বীর কুমার বাহাত্বরের কাছে যতদূর সম্ভব নিজেকে প্রেজেণ্টেব্ল করিবার জন্য ঘন ঘন দম লইয়া মাস্কিউলার হওয়ার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় "এই যে" বলিয়া স্বয়ং কুমার বাহাত্বর দর্শন দিলেন। ঘরে হুইটা বাতি ইতিমধ্যেই জ্বলিতেছিল, কুমার বাহাত্বরের পিছন পিছন ভৃত্য আসিয়া আরও হুইটা বাতি জ্বালিয়া দিল। কুমার বাহাত্বর ইঙ্গিতে তামাক দিতে বলিয়া আমার দিকে আগাইয়া আসিলেন। পুরা ছয় ফুট বিরাট চেহারা, গায়ে ঢিলাহাতা ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবি, রঙ কালো এবং রক্তবর্ণ কোটর-ছাপানো চক্ষু। আমি সসম্ভ্রমে পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়া লম্বা হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বিনীত নমস্কার করিলাম। কুমার বাহাত্বর নিজে একটা সোফায় বসিতে বসিতে বলিলেন, বস্থন। বলিয়া 'লণ্ডন লাইফে'র খোলা-পাতাটা বন্ধ করিয়া দিয়া একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, সময় হাতে নিয়ে এসেছেন তো? একটু সময় লাগবে। হ্যাঁ, আপনি টিটি, না কিছু চলে? লেমনেড একটা? উপেন!

আমার সম্ভ্রম ভক্তিতে পরিণত হইল, হ্যাঁ, শিকারী তো এই! বাজে ইয়ার্কি নাই, একেবারে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া গুলি ছোঁড়ার মত কথা বলেন, লাগিবার হইলে দড়াম করিয়া লাগে। আমি এতটুকু হইয়া গিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলাম।

উপেন আসিয়া আমাকে একটা লেমনেড এবং কুমার বাহাত্বরকে অপর একটা পানীয় দিয়া সোনার কাজ-করা চকচকে রূপার পানের ডিবা তাঁহার দিকে আগাইয়া ধরিল। আর একজন ভৃত্য ততক্ষণে একটা রূপার গড়গড়া হাতে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে উপস্থিত হইয়া

সটকাটা তাঁহার হাতে ধরাইয়া দিল। কুমার বাহাদুর চোখের ইঙ্গিতে তাহাদের বিদায় দিয়া দেওয়াল-গাত্রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, দেখছেন তো?

নেহাৎ দৈনিকের রিপোর্টার আমি, কিছুই দেখি নাই। এক দেওয়ালের নীচের দিকে সারি সারি তরওয়াল আর কিরিচ এবং তাহারই উপরে বাঘ, ভালুক, হরিণ, মহিষের মুখ—ভয়াবহ দৃশ্য। অপর দেওয়ালে কুমীর হইতে আরম্ভ করিয়া সলোন শেয়ালের চামড়া, একটা ধনেশ পাখীর ঠোঁট; ইচ্ছা হইল, কুমার বাহাদুরের পায়ের ধূলা লই, কিন্তু তৎপূর্বেই তিনি বলিলেন, রিভলবার, বন্দুক শোয়ার ঘরে সিন্দুকে আছে, বাইরে রাখা সেফ নয়, দিনকাল বড় খারাপ। যাক, কোথা থেকে শুরু করব? সি. পি., বিক্রমখোল, ঝার্‌সাগুদা, না হাফলং, লামডিং? হাতী না গণ্ডার?

আমি কি বলিব? গণ্ডার শিকারের ছবি পাওয়া যাবে তো? ইলাস্ট্রেটেড আর্টিক্‌ল হ'লে আজকাল—

কুমার বাহাদুর আমার কথা শেষ হইতে দিলেন না। অর্ধনিমীলিত নেত্রে সটকায় একটা লম্বা টান দিয়া পুনরায় উপেনকে ডাকিলেন, বলিলেন, সাত নম্বর অ্যালবামটা নিয়ে ভূতনাথকে আসতে বল।

ভূতনাথ আসিতেই কুমার বাহাদুর অ্যাল্‌বামটা তাহার হাত হইতে স্বয়ং লইয়া আমার দিকে আগাইয়া দিলেন, ভূতনাথ সেক্রেটারী দরজায় পর্দাটা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া বাহিরে যাইতেই কুমার বাহাদুর বলিলেন, বেছে নিন, ছবি বাছুন, তারপর শুরু করব।

পানীয় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল, উপেন পুনরায় গ্লাস ভর্তি করিয়া দিয়া গেল।

দেখিব কি? পাহাড়-পথে দল বাঁধিয়া হাতী চলিয়াছে, একটা গণ্ডার মাথা নীচু করিয়া শিং উঁচাইয়া আছে, তিনটা বাচ্চাসমেত এক জোড়া বাঘ। শ্রদ্ধা তখন আমার কপালে ঘাম হইয়া দেখা দিয়াছে, হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, বাঁশবনে ডোম কানা, গোটা চারেক—

আমার কথা শেষ হইল না, বিস্মিত ভক্তকে বিস্মিততর করিয়া অকস্মাৎ বিপুলকায় কুমার বাহাদুর 'বাবা রে' বলিয়া একটা আর্তনাদ করিয়া সোফা হইতে লাফাইয়া একেবারে টেবিলের উপর উঠিলেন। নগ্নমূর্তি সহ 'লণ্ডন লাইফ'টা ছিটকাইয়া নীচে পড়িল। আমার হাতের অ্যালবামটাও সঙ্গে সঙ্গে পায়ের কাছে পড়িল। ভাগ্যিস শীতকাল, পাখা ছিল না। বিহার ভূমিকম্পেও কোনও মানুষ এমন চমকাইতে পারে নাই। পাগলের পাল্লায় পড়িলাম না তো? কিংবা অপঘাতে মৃত বাঘ বা গণ্ডারের ভূত। কিন্তু আমাকে ভাবিবার

অবসর না দিয়া কুমার বাহাদুর ঘরের একটা কোণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওই, ওই—ব'সে ব'সে দেখেছেন কি মশাই? দিন না ওটাকে তাড়িয়ে।

আমি আর তখন আমাতে নাই। একটা আরসোলা কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া দেওয়ালের গায়ে জুড়িয়া বসিয়াছে। কি যে করিব—স্থির করিতে না পারিয়া বোকার মত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছি। কমার বাহাদুর কাতর কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি। হার্ট-ফেল করিয়ে মারবেন আমাকে?

কুমার বাহাদুর 'বাবা রে' বলিয়া একটা আর্তনাদ করিয়া সোফা হইতে লাফাইয়া

মদ, না বীরত্ব—ভাবিতে ভাবিতে রুমাল দিয়া আরসোলাটাকে চাপিয়া ধরিতে গেলাম, আরসোলা হইলেও তাহার এক জোড়া পাখা ছিল, সে উড়িতে শুরু করিল, কুমার বাহাদুরের নাকের উপর দিয়া,

কানের পাশ দিয়া—অতবড় প্রলয়-নাচনের ভার লইয়া সেণ্টার অব গ্র্যাভিটি ঠিক রাখা কঠিন—টেবিলটি কুমার বাহাদুর, কাশ্মীরি জাজিম এবং এক জোড়া কাচের গ্লাসসমেত সশব্দে উল্টাইয়া পড়িতেই উপেন, রামদীন যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল। আমি বেকুবের মত ততক্ষণে আরসোলাটা রুমালের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কার্পেটে হোঁচট খাইয়া কুমার বাহাদুর হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছেন, তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিতে গিয়া টেবিলটা উল্টাইয়া ফেলিয়াছি। সকলে শশব্যস্তে কুমার বাহাদুরকে টানিয়া তুলিয়া সোফায় বসাইয়া দিতেই তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। উপেন গ্লাসের ভাঙা টুকরাগুলা কুড়াইতে লাগিল। কুমার বাহাদুর ইঙ্গিতে সকলকে বাহিরে যাইতে বলিয়া কৃতজ্ঞতাগদগদ চিত্তে আমার হাতটা ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, বাইরে ফেলে দিয়েছেন তো? বাঁ হাতে তখনও স-আরসোলা রুমালটা ছিল। দিচ্ছি।—বলিয়া গাড়িবারান্দায় বাহির হইয়া রুমালটা ঝাড়িয়া বেচারী আরসোলাকে মুক্তি দিলাম।

রিপোর্ট আর লিখিতে হইল না এবং অদূরভবিষ্যতে আমি সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারও আর থাকিলাম না। জগদ্বিখ্যাত শিকারী কুমার ধূর্জটিনারায়ণের যে সচিত্র শিকার-কাহিনীগুলি মাসিকের পৃষ্ঠায় মাসে মাসে পড়িয়া আপনারা যুগপৎ পুলকিত, বিস্মিত, ভীত, চকিত, আনন্দিত ও ঘর্মাপ্লুত হইয়া থাকেন, বর্তমানে এই অধমই সেগুলির লেখক এবং আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি, ছবি ধরা পড়িবার ভয় থাকিলেও লেখাগুলি অরিজিনাল, নিতান্তই আমার স্বকপোলকল্পিত, শিশু-সাহিত্যে এ বিষয়ে আমার বিশিষ্ট দান এবং 'অবদানে'র কথা আশা করি আপনারা ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হন নাই। খাইতে পাইতাম না, এখন খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া আছি, আমার নালিশ করিবার কিছুই নাই। তবে বেচারা ভূতনাথের জন্য দুঃখ হয়, সে আমার উপরে ঘোরতর চটিয়া আছে; কারণ তাহার বিশ্বাস, আমিই ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারিশিপ ঘুচাইয়া তাহাকে ইসলামপুর মহলে নায়েব করিয়া পাঠাইয়াছি। আসলে যে সামান্য একটি আরসোলা সমস্ত ব্যাপারটির মূলে, বিখ্যাত শিকারী ধূর্জটিনারায়ণের ভূতপূর্ব প্রাইভেট সেক্রেটারী ভূতনাথ তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই।

পান্নালাল

যাঁহারা তরুণ বলিতে নরুনপাড় ধুতি-পরিহিত, অতিরিক্ত কাব্যপাঠের দরুন চশমারূপ যন্ত্রের সাহায্যে পথ চলিতে চলিতে যে কোনও চওড়া-পাড় চলিষ্ণু শাড়িকে তরুণী কল্পনা করিয়া করুণভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া বরুণ দেবতার কোলে দেহরক্ষা করিতে দ্বিধা করে না—এরূপ এক সম্প্রদায়ের বাঙালী ছোকরার কথাই মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চই আমাদের পান্নালাল হাজরাকে দেখেন নাই। পান্নালাল তরুণ বইকি। যে বৎসর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, পান্নালাল সে বৎসর হামাগুড়ি দিয়া দরজার চৌকাঠ ডিঙাইতে শুরু করিয়াছে, অভিধানে পাওয়া যায় এমন দুই চারিটি শব্দও উচ্চারণ করিতেছে এবং মায়ের কোমর ধরিয়া প্রায় উদয়শঙ্করী ভঙ্গিতে নাচিতেও আরম্ভ করিয়াছে; সুতরাং পান্নালালকে পোস্ট-ওয়ার তরুণও বলা চলে। তাহা ছাড়া সে যখন এম. এ. পড়িতেছে এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে গত বৎসর বি. এ. ডিগ্রী লইয়াছে, তখন একই অধ্যাপকের নাকের সম্মুখে আধুনিক তরুণীদের পাশে বসিয়া ক্লাস করিয়াছে নিশ্চয়ই, একই গেট দিয়া বাহির হইয়া তাহাদের পিছনে পিছনে সদর রাস্তা পর্যন্ত যে যায় নাই, অথবা একই ট্রামে বা বাসে কচিৎ কখনও ভ্রমণ করে নাই, এমন কথা হলপ করিয়া বলা যায় না। চোখোচোখি বা ছোঁয়াছুঁয়ি নিশ্চয়ই হইয়া থাকিবে, তবে তাহাতে সাধারণত যে রোমান্সের কল্পনা করিয়া আমাদের মনে পুলক-সঞ্চার হয়, পান্নালালের ক্ষেত্রে তাহা দানা বাঁধিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই; সে কটমট করিয়া চাহিয়াছে এবং ধাক্কা দিয়া নিজের পথ করিয়া লইয়াছে মাত্র।

পান্নালালের চেহারা ভাল, শরীর রীতিমত মজবুত, চুল ব্যাক-ব্রাশ করা, চওড়া কপাল, চশমাহীন চোখ, মানানসই নাক, গোঁফের রেখামাত্র আছে, শ্যামবর্ণ, হাফ-হাতা শার্ট, মালকোঁচা-মারা ধুতি—মুখে চোখে প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি; সমস্ত দেহে চপল তারুণ্য—পাঞ্জা কষিয়া, ঘুষি ছুঁড়িয়া ও নানাবিধ দুষ্টামি করিয়া তাহার প্রকাশ; কবিতা লিখিয়া, প্রেমপত্র ছাড়িয়া বা চোরা চাউনি ছুঁড়িয়া নহে। কলেজে স্পোর্টসে সর্বাগ্রে তাহার নাম; প্রফেসর জব্দ করার পাণ্ডা সে। এক কথায়, পান্নালাল তরুণ হউক আর নাই হউক, অত্যন্ত মডার্ন।

কলেজে তাহার সহপাঠীদের মধ্যে তথাকথিত তরুণের অভাব নাই। তাহারা জটলা করিয়া দেখে, একলা একলা মজে; বারোয়ারি বউদিদিদের কাছে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, বায়রন

অনুবাদ করিয়া প্রেমপত্র লেখে, কলেজ হইতে লুকাইয়া পটাসিয়াম সায়ানাইড সংগ্রহ করে এবং মাঝে মাঝে মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে টাকা খানেকের রজনীগন্ধা অথবা গোলাপফুল কিনিয়া শয্যায় বিছাইয়া মরিয়াও বসে ; তাহারা অতি-আধুনিক গল্প-কবিতা নিজেরা পড়িয়া সহপাঠিনীদের পড়াইতে চায়, ঠিকানা ভুল করিয়া তাহাদের দুই একখানা উদগ্র সাইকলজিকাল উপন্যাস সহপাঠিনীদের বইয়ের বোঝার মধ্যে চলিয়া যায়, ছবিও যে দুই চারখানা এদিক ওদিক গিয়া না পড়ে তাহা নয় ; কোন্ বান্ধবী কবে কোন সিনেমায় যাইবে, তাহার হিসাব তাহারা রাখিয়া থাকে এবং মাসিক সাপ্তাহিকে দুই একটা উদ্দেশ্যমূলক কবিতাও ছাপাইয়া থাকে। পান্নালাল এই সব পিঁচুটিমার্কা ছেলেদের সুনজরে দেখে না।

পান্নালাল যখন ফোর্থ ইয়ার আর্ট্‌সে, মিস্ করুণা মিত্রের সে বছর থার্ড ইয়ার। একেবারে যাহাকে বলে অপরূপ, সে ছিল তাহাই। বাপ বড়লোক, ভবানীপুর হইতে মোটরে কলেজে আসিত। সে যে দেখিবার মত একটা বস্তু—এ কথা কলেজের খোঁড়া দারোয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া বুড়া প্রফেসরগুলা পর্যন্ত মনে মনে স্বীকার করিতেন ; ছেলেদের তো কথাই নাই। এক পিরিয়ড হইতে অন্য পিরিয়ডে ঘর বদলের সময় পথে বারান্দায় একেবারে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত—করুণা ঘামিয়া চুমিয়া একেবারে লাল হইয়া তবে ক্লাসে ঢুকিতে পারিত।

এ হেন করুণা মিত্র পান্নালাল হাজরার প্রেমে পড়িয়া গেল। সহপাঠিনীদের নিষ্কাম দূতীগিরির চোটে পান্নালালের গায়েও একদিন আচমকা ইহার আঁচ আসিয়া লাগিল। সে প্রথমটা একটু থতমত খাইল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া ক্রিকেট-মাঠের ফিল্ডিঙের চোখে একবার আপাদমস্তক করুণাকে দেখিয়া তাহার মন্দ লাগিল না। বাস্, সেই এক সেকেণ্ড। তারপর গুজগুজ ফুসফুস না করিয়া সে একেবারে সোজা করুণার গাড়ির কাছে গিয়া বলিল, স্ট্রেট বাড়ি যাবেন তো ? আমি আপনার সঙ্গে রসা রোড পর্যন্ত যাব। দেবেন একটা লিফ্‌ট ?

বিষম অবাক হইলেও করুণা খুশি হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করা উচিত—প্রথমটা হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া একবার ড্রাইভারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া ফেলিল, তা বেশ তো, আসুন না। কলেজের গেটের সামনে তখন অর্ধোদয় স্নানের ভিড়।

গাড়ি ছাড়িতেই পান্নালাল ভূমিকামাত্র না করিয়া বলিল, শুনলুম, আপনি নাকি আমাকে ভালবেসেছেন ?

ড্রাইভারের সামনে লটকানো আয়নাটায় করুণার লজ্জিত মুখখানা মন্দ দেখাইল না। সে যেন একটা ধাক্কা খাইল, এই অপ্রত্যাশিত অভদ্র প্রশ্নের জবাবই বা সে কি দিবে ?

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটু ঠেস দিয়াই বলিল, আপনার আত্মপ্রত্যয় তো দেখছি অসাধারণ।

আন্‌ডণ্টেড পান্নালাল এবার অবাক। এক মিনিট মাথা চুলকাইয়া সে বলিয়া উঠিল, তা হ'লে গুজবটা মিথ্যে। ধন্যবাদ। এই ড্রাইভার, রোখো।

লজ্জায় নিজের গাড়ির তলায় পড়িয়া করুণার মরিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহার সময় ছিল না। সুতরাং লজ্জার মাথা খাইয়াই সে পান্নালালের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, যা শুনছেন সত্যি, কিন্তু—

চট করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া পান্নালাল বলিল, ওসব কিন্তু-টিন্তু আমি বুঝি না। প্রেমে প'ড়ে থাক, ভাল। তবে আরও দু বছর সবুর করতে হবে। এম. এ. টা পাস ক'রে নিই। এর মধ্যে এক ছত্র চিঠি লিখবে না বা কখনও আমার দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চাইবে না। রাজী?

করুণার হাসি পাইল, ভাল লোককে সে বাছিয়া লইয়াছে। গম্ভীর হইয়া বলিল,

আবার কিন্তু?

বাবা মা যদি এর মধ্যে অন্য কোথাও আমার বিয়ে দিয়ে ফেলেন?

খুন হয়ে যাবেন, খুন হয়ে যাবেন।—বলিতে বলিতে পান্নালাল চলন্ত গাড়ির দরজা খুলিয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়িল। গাড়ি তখন পোড়াবাজারের মোড় ফিরিতেছে।

বি. এ. পাস করিয়া পান্নালাল যখন ইউনিভার্সিটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হইল, তখন দুইজনের প্রথম ছাড়াছাড়ি। তথাপি ছাত্রছাত্রী-মহলে সকলেই জানিত, রামের যেমন সীতা, সত্যবানের যেমন সাবিত্রী, পান্নালালের তেমনই করুণা;—দুইজনের সম্পর্ক জ্যামিতির যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু করুণার বাপ-মায়ের তাহা জানিবার কথা নয়। অমন চেহারা এবং এমন গুণ—মেয়েকে যে কোনও আই. সি. এস. লুফিয়া লইবে; নিদেন পক্ষে একজন ব্যারিস্টার। মোদ্দা কথা, পয়সাওয়ালা বিলেতফেরত একজন চাইই।

পান্নালালের সেদিকে হুঁশ নাই। সে কলেজে বরাবর রাইট-অ্যাবাউট-টার্ন করিয়াছে, করুণাদের বাড়ির দরজা কখনও মাড়ায় নাই। সে জানিত, যেদিন দরজা মাড়াইবে, সেদিন একেবারে শ্বশুরশাশুড়ীকে করণীয় প্রণামটাও সারিয়া লইবে; তৎপূর্বে যাতায়াত, লেগ-বিফোর-উইকেটের মত, ভাল নয়। করুণা নিজের স্বার্থ ভাবিয়া বাবা-মার সহিত পান্নালালের

আলাপ করাইতে ব্যস্ত হইত, কিন্তু পান্নালালের ধমকে চুপ করিয়া যাইত। তাহার ব্যস্ততার আরও একটা কারণ ধীরে ধীরে গজাইয়া উঠিতেছিল—ব্যারিস্টার বারিদবরণ রায় সম্প্রতি বড় ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করিয়াছে। মায়ের তাহাকে ভারী পছন্দ, এবং মায়ের পছন্দই বাবার পছন্দ।

করুণার শাড়ি ও ব্রাউজের রঙমিল বা রঙছুট লইয়া ব্যারিস্টার বারিদবরণ আজকাল মাথা ঘামাইতে শুরু করিয়াছে, কলেজ হইতে ফিরিতে দেরি হইলে এক্স্‌প্লানেশন চায়। করুণা ভিতরে ভিতরে রাগে গরগর করিতে থাকিলেও ভয়ে পান্নালালকে কিছু বলে না। টাকের উপর আবার পান্নালালের টাঁক বেশি।

পান্নালালের এম. এ. পরীক্ষার আর বছরখানেক বাকি, করুণা বি. এ. পাস করিয়া ঘরে বসিয়া আছে; ভারতীয় বাছাই টীমের সঙ্গে পান্নালালের সাউথ আফ্রিকা যাইবার কথা উঠিয়াছে। করুণা প্রমাদ গণিল। নানা দিক বিবেচনা করিয়া একদিন ইউনিভার্সিটির দরজায় পান্নালালকে ধরিয়া বলিল, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

পান্নালাল তখন বেলেঘাটায় ভিজিয়ানাগ্রামের সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে স্থির করিয়াছে, ভয়ানক ব্যস্ত, চ্যালারা সব তাহার পিছনে। চটিয়া উঠিয়া বাঁ হাতের বুড়া আঙুল দিয়া পুঁটিরামের দোকানটা দেখাইয়া বলিল, ওইখানে যাও, এটা ইউনিভার্সিটি।

করুণাও চটিল, বলিল, তা জানি। তোমাকে এখনই আমার সঙ্গে আসতে হবে, কথা আছে।

পান্নালাল রাগিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু করুণার মুখ দেখিয়া তাহার মনে হইল, ব্যাপারটা গুরুতর। চ্যালাদের হাতের ইশারায় কি বলিল বুঝা গেল না, করুণাকে বলিল, চল।

রয়াল হোটেলে চায়ের অর্ডার দিয়া একটা পার্টিশন-করা খোপে ঢুকিয়া পান্নালাল বলিল, ব্যাপার কি বল তো?

করুণা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ব্যারিস্টার বারিদবরণ।

চড়াৎ করিয়া পান্নালালের মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল, বলিল, গড ব্লেস হিম।

করুণা তাহাকে আরও চটাইবার জন্য বলিল, গড নয়, পুরুত—আসছে অঘ্রাণে।

বটে!—বলিয়া রাগে পান্নালাল একটা আট আনা দামের আস্ত কেক মুখে পুরিল।

করুণা ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিল, বলিল, কর কি? অসুখ করবে যে!

করুক অসুখ। আমি যাব না সাউথ আফ্রিকা। বয়!

করুণা বলিল, বয় নয়, এবার বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হুঁ, তোমার বাবা নয়, একেবারে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা করব। জড় মেরে দেব একেবারে। বয়।

করুণা ভয় পাইয়া বলিল, আবার বয়! পালিয়ে বিয়ে করবে নাকি আমাকে?

পান্নালাল এবার ভীষণ চটিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, অ্যাম নট এ কাওয়ার্ড। তোমার বাবা সম্প্রদান করবেন, তবে বিয়ে করব।

করুণা বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, আরও ক্রিকেট খেলে বেড়াও। মেয়ে না হয়ে ক্রিকেটের বল হ'লেও—

ফাজলামি ক'রো না। বয়!

করুণাকে পান্নালাল যখন বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা হইবে। ব্যারিস্টার বারিদবরণ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাহিরের ঘরে করুণার মায়ের সহিত গল্প করিতেছে, দেখা গেল। করুণা অনুভব করিল, পান্নালালের হাতের মাস্‌ল ক্রমশ শক্ত হইতেছে। ভয় পাইয়া বলিল, প্রতিজ্ঞা কর, বিশ মিনিটের মধ্যে হ্যারিসন রোড পৌঁছবে, নইলে আমি ঘরে ঢুকব না। বল।

পান্নালাল প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, চাপিয়া গিয়া চলিতে চলিতে বলিল, আচ্ছা—আচ্ছা।

বক্সিঙের চ্যালা হরেকৃষ্ণ শীল হইল স্পাই। সে যথারীতি রিপোর্ট দাখিল করিতে লাগিল।

৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৭½টা হইতে ৯টা—করুণার গান, পাঁপরভাজা, চা।

৫ই সেপ্টেম্বর—বৈকাল ৫½টা—মা, বারিদবরণ, করুণা—লেক, জলে ঢিল ছোঁড়া।

১৯এ সেপ্টেম্বর—ঐ তিনজন—মার্কেট, গিয়াসুদ্দিন—কেক, চকোলেট, বারিদবরণের মানি-ব্যাগ। চ্যাটার্জির ফুলের স্টল—বারিদবরণ, ফুল।

২৩এ সেপ্টেম্বর—বাড়ির ছাদ—করুণা, মা, পরে বারিদবরণ। মা নীচে, পরে করুণাও।

২৪এ সেপ্টেম্বর—বারিদবরণ—ডিনার—রাত্রি ১২টা।

১লা অক্টোবর রাত্রি আটটায় রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এল. সি. মিত্র মহাশয়ের 'হার্মিটেজ' নামক বাড়ির দরজায় কোলাপ্‌সিব্‌ল গেটের সামনে একজন লম্বা

জোয়ান পুরুষ হিন্দুস্থানী দারোয়ানের সহিত তর্ক করিতেছে, দেখা গেল। তাহার বাম বগলে বালিশ-মোড়া একটি শতরঞ্চি এবং ডান হাতে একটি প্রমাণ সাইজ সুটকেশ। দারোয়ান যত বলিতেছে, ই বাড়ি নেহি হ্যায় বাবু, সে ব্যক্তি ততই জিদ চড়াইয়া বলিতেছে, আরে বাবা, এহি বাড়ি, ই তো বিশ নম্বর হ্যায়? শেষ পর্যন্ত কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট ফাঁক হইতে লাগিল, দারোয়ান আর রাখিতে পারে না। দারোয়ান হাঁকিল—সাব!
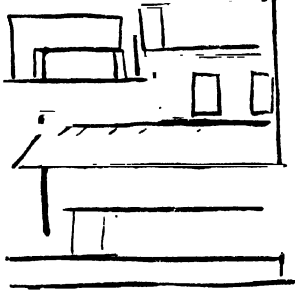
বক্সিঙের চ্যালা হরেকৃষ্ণ শীল···যথারীতি রিপোর্ট দাখিল করিতে লাগিল

বারিদবরণ তখন ড্রয়িং-রুমের সোফায় বসিয়া করুণার ছেলে-বেলার ফটোর অ্যাল্‌বাম দেখিতেছিল, করুণার মা চোখে চশমা আঁটিয়া কি একটা পত্রিকা পড়ার ফাঁকে

ভাবী জামাতা বারিদবরণের সহিত বার্তালাপ করিতেছিলেন। 'সাব' অর্থাৎ মিঃ মিত্র কাছাকাছি কোথাও গিয়া থাকিবেন।

দারোয়ানের চীৎকার শুনিয়া বারিদবরণ ছুটিয়া আসিল, বলিল, কোন্ হ্যায় ?

দারোয়ান তখন প্রায় ঘায়েল হইয়াছে, ক্লান্ত কণ্ঠে বলিল, হুজুর, বোলতেঁহে সাবকা দামাদ, বাকি—

আগন্তুক চীৎকার করিয়া বলিল, বাকি কি রে ব্যাটা ? নগদ জামাই।

মিসেস মিত্র এতক্ষণ ড্রয়িং-রুমের পর্দা ফাঁক করিয়া ব্যাপার কি দেখিতেছিলেন, তাঁহার পিছনে করুণা উঁকি মারিতেছিল। পান্নালাল ইহার মধ্যে ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া করুণাকে চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল। করুণা ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

বারিদবরণ ব্যারিস্টার ছুটিয়া মিসেস মিত্রের কাছে আসিল, বলিল, আপনাদের কোনও জামাই হবে।

মিসেস মিত্র আকাশ হইতে পড়িলেন, অমন একটা গলাবন্ধ কোট গায়ে বোঁচকা-সম্বলিত লোকের সহিত আত্মীয়তা স্বীকার করিতে তাঁহার লজ্জা হইবার কথা। বলিলেন, জামাই ? তা হবেও বা, মিত্তির গুষ্টির সবাইকে আমি আবার চিনিও না। ডালপালা নিয়ে বংশটি তো সোজা নয়। তা বাপু, উনি আসা পর্যন্ত ঐ ঘরে বসতে বল, ও চোয়াড়ে চেহারার সামনে আমি বেরুতে পারব না।

মায়ের কথা শুনিয়া করুণা মনে মনে গজরাইতে লাগিল, চোয়াড়ে চেহারাই বটে !

বিপদ বুঝিয়া ব্যারিস্টার বারিদবরণ সেদিন বিদায় লইল।

যে ঘরে পান্নালালকে বসিতে দেওয়া হইল, সেটা চাকরবাকরদের ঘর, এক রকম খালিই থাকে। একটা তক্তাপোশ পাতা আছে, তাতে অনেককালের বাসি ধুলা। পান্নালাল তাহারই উপরে শতরঞ্জিটা পরিপাটি করিয়া পাতিয়া লইল। দুই দিকের দেওয়ালে দুইটা তাক ধূলিমলিন জীর্ণ বই দিয়া ঠাসা ; তাহারই একটা টানিয়া লইয়া ধূলি ঝাড়িয়া পড়িতে বসিবে—পিছনের দরজা দিয়া করুণা পা টিপিয়া টিপিয়া উপস্থিত। বলিল, এ করছ কি ? তোমার জ্বালায় কি শেষে আত্মহত্যা করব ?

পান্নালাল গম্ভীরভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, তার দরকার হবে না। তুমি শুধু কালা-বোবা সেজে ব'সে থাক।

করুণা রাগিয়া বলিল, সোজা কথা কিনা! তোমাকে যা-তা সব বলবে—

বলুকগে।

করুণা আর থাকিতে পারিল না, পান্নালালের হাত হইতে জীর্ণ বইখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল, আর ভালছেলেগিরি ফলাতে হবে না। ওঠ, তক্তাপোশটা ঝেড়ে দিই।

দারোয়ান যেখানে বসে, সেখান হইতে ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, দিদিমণি আগন্তুক বাবুকে উঠাইয়া তক্তাপোশের ধূলা ঝাড়িতেছে। সে স্থর করিয়া তুলসীদাস পড়িতে লাগিল।

ব্রিজ খেলায় হারিয়া উত্তেজিতভাবে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মিঃ মিত্র বাড়ি ফিরিলেন। গৃহিণীর মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, সর্বনাশ করেছ, জামাই, না আমার মুণ্ডু! ও নিশ্চয়ই স্বদেশী ডাকাত, ফেরারী, আজকাল এ রকম আকছার হচ্ছে। চল, কোথায় দেখি।

আমি বাপু পারব না, তুমি একলাই যাও।

মিঃ মিত্র অগত্যা শঙ্কিত চিত্তে কম্পিত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া পান্নালালের হাতকাটা গেঞ্জি চড়ানো শক্ত-সমর্থ চেহারাটা দেখিয়াই যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, তা বাবাজী, মুখ হাত ধুয়েছ তো, জল-টল—

পান্নালাল দ্রুত উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে, সে হবে 'খন।

তা বাবা তুমি বুঝি—

পান্নালাল মাথা চুলকাইতে লাগিল। তাহার লজ্জাটা মিঃ মিত্র নিজেই যেন অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি বুঝি আমাদের স্থরেশের জামাই? অনেকদিন তো তাদের সঙ্গে—

মরিয়া হইয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য পান্নালাল বলিল, আপনাদের শরীর ভাল আছে তো? আর রুবি? তাকে সেই—

রুবি করুণার ডাকনাম।

মিত্র মহাশয় হঠাৎ লজ্জা অনুভব করিলেন। ভাবিলেন, অন্যায় হইতেছে, ছোকরা স্বদেশী ডাকাত নয়, নিকট-আত্মীয়ই কেহ হইবে। নেহাৎ চাকরদের ঘরটায় তাহাকে—

তা বাবা, মুখ হাত ধোও, খাওয়া-দাওয়া কর। ওরে হরে!

হরি আসিতেই বলিলেন, দেখ, দক্ষিণের কুঠুরিটা—

খুড়তুতো ভাই সুরেশের কাছে পাছে অপ্রস্তুত হইতে হয়—এই ভাবিয়া তিনি শঙ্কিতই হইয়া পড়িলেন।

প্রথম রাত্রের ফাঁড়া নির্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। করুণা কিন্তু সে রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই পান্নালাল হরিকে ডাকিয়া পোয়াটাক ছোলা ভিজাইতে বলিয়া ঘটা করিয়া ডন বৈঠক শুরু করিল। ছোলা-ভিজার কথা শুনিয়া সদ্যঘুমভাঙা মিত্রগৃহিণী চটিয়াই আগুন। কি বলিতে যাইতেছিলেন, করুণা চাপা দিবার জন্য বলিয়া উঠিল, তুমি জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে না মা?

দায় পড়েছে আমার!—বলিয়াই তিনি একবার দক্ষিণের কুঠুরির বারান্দাটা ঘুরিয়া আসিলেন, খালি গায়ে মাস্‌ল-ফোলা পান্নালাল তখন দরদর করিয়া ঘামিতেছে ও গুনগুন করিয়া একটা ভজন গাহিতেছে। দৃশ্যটা মিত্র-গৃহিণীর মন্দ লাগিল না। চমৎকার শরীর! নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মন স্নেহসিক্ত হইতে লাগিল। মিঃ মিত্রের কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি যাও একবার, ভাল ক'রে জামাইয়ের সঙ্গে—

এই ফাঁকে করুণা চট করিয়া একবার ঘরে ঢুকিল, বলিল, খুব রঙ্গটাই শুরু করেছ যা হোক! শেষরক্ষে কিসে হবে শুনি?

পান্নালাল যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনভাবে বলিল, আদা আছে? নুন আর আদা?

কি বুদ্ধি তোমার! আমি আনব কি ক'রে? হরিকে ডেকে বল।

ছোলা-ভিজা, নুন, আদা, মধু, দাঁতন—সাহেব-আখ্যাত রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে যেন সত্যই ডাকাত পড়িয়াছে। যে কোনও মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত আশঙ্কা করিয়া করুণা ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে লাগিল। পান্নালাল নির্বিকারচিত্তে হুকুম দিল, খাঁটি সরষের তেল চাই আধ পোয়া।

হরি অনেককাল এ বাড়িতে কাজ করিতেছে, কিন্তু এমনটি কখনও দেখে নাই। ফিরিঙ্গী বারিদবরণকে দেখিয়া দেখিয়া তাহার মেদিনীপুর-মার্কা প্রাণে মাঝে মাঝে বিরক্তি ধরিত। আগন্তুকের ধরনটা নূতন হইলেও দেশী। সে খাঁটি সরিষার তেল আনিতে ছুটিল।

গতরাত্রের জামাই-আসার ব্যাপারটা কতদূর গড়াইল, তাহা দেখিবার জন্য বারিদবরণ সকালেই আসিয়াছিল। তেল মাখিয়া স্নান সারিয়া পান্নালাল তখন চা খাইতে ড্রয়িং-রুমে আসিয়াছে, বারিদবরণের ঠিক পাশেই তাহার চেয়ার। দৈনিক বাজার করা মিঃ মিত্রের

বিলাস, তিনি বাজারে গিয়াছেন। চা আসিয়াছে, করুণা এককোণে বসিয়া গম্ভীরভাবে পাশাপাশি উপবিষ্ট বারিদবরণ ও পান্নালালকে দেখিতেছে, মিত্রগৃহিণী রান্নার তদারক করিতে ভিতরে গিয়াছেন।

কথায় কথায় বারিদবরণ প্রশ্ন করিল, আপনি থাকেন কোথায় ?

কাহারও দিকে না তাকাইয়া চায়ে-চুমুক দিতে দিতে পান্নালাল বলিল, কলকাতা, হ্যারিসন রোড।

বারিদবরণ চমকিয়া উঠিল, বলিল, মানে ?

করুণা বিপদ গণিল, সে আর ঘরে থাকিতে সাহস করিল না।

পান্নালাল শান্তভাবে পেয়ালাটা সামনের ট্রেতে রাখিয়া চেয়ারটা ঘুরাইয়া বারিদবরণের মুখামুখি বসিয়া বলিল, মানে অতি সোজা, আপনাকে তাড়াতে এসেছি।

পান্নালালের দেহটার দিকে আপাদমস্তক চাহিয়া বারিদবরণ একবার টাকে হাত বুলাইল, তারপর খামকা চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, তার মানে ? হোয়াট ডু ইউ মীন ?

আই মীন হোয়াট আই সে।

বারিদবরণ আরও চেঁচাইতে যাইতেছিল, পান্নালাল বলিল, চুপ, চেঁচিয়েছেন কি ঘাড় ধ'রে—

কি ?

কিছু নয়, সামান্য ব্যাপার। করুণার আশা আপনাকে ছাড়তে হবে, ট্রাই ইওর লাক এল্‌স্‌হোয়্যার। ও আমার।

বারিদবরণ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল, কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, গায়ের জোর নাকি ? মিঃ মিত্রকে—

সোজা এখান থেকে বাড়ি যাবেন। মিঃ মিত্র কিংবা মিসেস মিত্রকে কিছু বলেছেন কি ফাটিয়ে দোব আপনার টাক। পান্নালাল হাজরার নাম শুনেছেন ?

বক্সার ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিই আপনার সম্মুখে। গুড্‌বাই।

বারিদবরণ ব্যারিস্টার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বাহির হইয়া গেল। একেবারে ল্যান্সডাউন মার্কেটের পথে।

মাঝরাস্তায় হরেকৃষ্ণ তাহাকে ধরিল, বলিল, এদিকে নয়, মিঃ রায়। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার হুকুম আছে আমার ওপর। একটা ফিটন ডাকব ?

বারিদবরণ ভাবিল, গুড গড, ইংরেজ-রাজত্ব কি আর নাই।

বারিদবরণকে বাড়ির দরজা-তক পৌঁছাইয়া দিয়া হরেকৃষ্ণ বলিল, নমস্কার, আমরা আশেপাশেই থাকব। মিঃ মিত্রের বাড়ির দিকে কদিন যাবেন না যেন, দেখবেন। নমস্কার।

রাগে ও গরমে বারিদবরণের টাকে ঘাম দেখা দিল। টেলিফোনও ছাই মিঃ মিত্রের বাড়িতে নাই যে,—। তাহা ছাড়া সেই গুণ্ডাটা সেখানে আস্তানা গাড়িয়াছে।

বারিদবরণ-সমস্যা যতক্ষণে শেষ হইল, ততক্ষণে পান্নালাল চা খাইয়া দক্ষিণের ঘরে নিশ্চিন্ত আরামে খবরের কাগজ পড়িতে বসিয়াছে। মিঃ মিত্র বাজার হইতে ফিরিয়াছেন এবং বারিদবরণ তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া চলিয়া যাওয়াতে গৃহিণীর উপর তম্বি করিতেছেন। করুণা এই অবসরে চুপি চুপি পান্নালালের কাছে গিয়া বলিল, এসব করছ কি বল তো? আমাকে পাগল না ক'রে ছাড়বে না দেখছি। ধরা পড়লে—

পড়লে কি? ধরা তো পড়বই।

বাবা যদি পুলিস-টুলিস ডাকেন, যদি তোমায় অপমান করেন?

সতী দেহত্যাগ করবে, আমি দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দোব। তোমাকে কাঁধে ফেলে ধেই ধেই ক'রে নাচব।—বলিয়া পান্নালাল করুণাকে কাঁধে তুলিতে গেল। করুণা পলাইয়া বাঁচিল।

মিঃ মিত্র ও পান্নালাল টেবিলে সামনাসামনি খাইতে বসিয়াছে, খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, মিঃ মিত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, তা হ'লে সুরেশের—

মিসেস মিত্র চাটনি আনিতে রান্নাঘরে গিয়াছেন, করুণা সামনের বারান্দায় পায়চারি করিতেছে, তাহার ঘোর সবুজ রঙের লালপাড় শাড়িটা পান্নালালের মগজে রঙ ধরাইয়া দিল। সে হঠাৎ হাত গুটাইয়া লইয়া বলিল, আজ্ঞে, আমি সুরেশের কেউ নই।

মিত্র সাহেব চমকাইতেই দইয়ের প্লেট হইতে চামচটা ঝনাৎ করিয়া মেঝেতে পড়িল। এমন ভয় পাইয়া গেলেন যে, মনে হইল, তিনি একটা রিভল্‌ভারও যেন দেখিয়াছেন। গোড়ায় যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই বুঝি ঠিক; স্বদেশী ডাকাতের আসামী না হইয়া যায় না। চটিয়া পুলিস ডাকাও ঠিক হইবে না।

মিঃ মিত্রের গোড়ার সন্দেহের কথাটা পান্নালাল করুণার কাছে শুনিয়াছিল,

বিনীতভাবে বলিল, কোনও উপায় ছিল না আমার। পুলিসে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে, আমি নিরুপায় হয়ে—

সর্বনাশ! চট্টগ্রাম?

আজ্ঞে না, হিলি। কটা দিন আমাকে আশ্রয় দিন, আপনাকে বিপদে আমি ফেলব না। দুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেই—

এতদিন পরে মিঃ মিত্র ইষ্টদেবতার শরণ লইলেন। তাঁহার মনে হইল, টিকটিকি পুলিসে তাঁহার বাড়ি ঘেরাও করিয়াছে, থানায় এজাহার আর আদালতে সাক্ষী দিতে দিতে তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, হয়তো আসামীর কাঠগড়াতেই তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে, গৃহিণী এবং করুণার উপরও নিশ্চয়ই জুলুম চলিবে, আর মাসিক পেন্‌শনের টাকাগুলি—

মিঃ মিত্র আর ভাবিতে পারিলেন না; চট করিয়া এঁটো হাতেই পান্নালালের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, বাবা, আমি বুড়ো মানুষ, তুমি আমার ছেলের বয়সী, আমাকে বাঁচাও বাবা।

মিত্র-গৃহিণী চাটনি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন, স্বামীর কাণ্ড দেখিয়া তিনি অবাক। সাহেব তো সকালে কখনও সেই ওষধটা খান না, তবে?

জানালার ফাঁক দিয়া করুণা ঘটনাটা দেখিয়া গিয়াছে। পান্নালাল আঁচাইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত পান চিবাইতে চিবাইতে দক্ষিণের ঘরটায় প্রবেশ করিতেই সে ঝড়ের মত সেখানে গিয়া বলিল, দেখ, বাবাকে নিয়ে যদি অমন রসিকতা শুরু কর, তা হ'লে আমি মার কাছে সব ফাঁস ক'রে দোব কিন্তু। বাবা বুড়ো মানুষ—

পরে সুদে আসলে সব শোধ দোব রুবি, এখন বেগতিক। তোমার টেকো ব্যারিস্টারটার চিঠি এসে পড়বে আজ সন্ধ্যায়, না হয় কাল সকালে, তখন? আসল লোকটাকে না হয় হরেকেষ্টর জিম্মায় রেখে দিয়েছি, এখন ডাকঘরকে ঠেকাই কি ক'রে?

ওই বুদ্ধি নিয়েই তুমি শেষরক্ষে করবে ভেবেছ, না? মশাই, চিঠির ব্যবস্থা আমি করব, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু এদিকে অঘ্রাণ মাস যে এসে পড়ল, তার হিসেব আছে?

পান্নালাল যেন সদ্য আকাশ হইতে পড়িল, চোখ দুইটা ছানাবড়ার মত করিয়া সে একবার করুণার দিকে চাহিল। পরক্ষণেই চট করিয়া মালকোঁচা মারিয়া লইয়া ডান হাতের চাপড়ে বাঁ হাতের বাইয়ে কুস্তিগীরের ভঙ্গিতে আওয়াজ তুলিতে তুলিতে বলিল, কুছ পরোয়া নেহি।

করুণা আর অপেক্ষা না করিয়া বাবার ঘরে আড়ি পাতিতে ছুটিল।

স্বামী-স্ত্রীতে ততক্ষণে পরামর্শ স্থির হইয়া গিয়াছে। রুবির বিয়েটা লইয়াই যত গোল, নতুবা তাঁহারা আজই শিমুলতলা রওনা হইয়া আত্মরক্ষা করিতেন। বারিদবরণের সঙ্গে অবিলম্বে দেখা হওয়া দরকার। সে পর্যন্ত ডাকাতটাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই।

সন্ধ্যার দিকে মিঃ মিত্র বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রি আটটা নাগাদ তিনি রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া যখন বারিদবরণের বাসা হইতে ফিরিলেন, তখন এদিকেও বিষম বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে।

পান্নালাল এবং করুণার কলেজঘটিত ব্যাপারের বিবরণ সংগ্রহ করিতে বারিদবরণকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ছাত্রছাত্রী-মহলে তাহারা উভয়ে বিশেষ পরিচিত ; তাহাদের প্রেম এত পুরাতন যে, সকলে প্রায় তাহা ভুলিতে বসিয়াছে। কেবল মিঃ মিত্র, মিসেস মিত্র এবং ব্যারিস্টার বারিদবরণই যেন চোখ বুজিয়া কাল কাটাইতেছিলেন।

মিঃ মিত্র বাড়ির বাহির হইয়া যাওয়ার পরেই মিসেস মিত্রও ছাতে উঠিয়া পায়চারি শুরু করিয়াছিলেন ; হঠাৎ কি একটা কাজে নীচে নামিয়া করুণাকে আপেলের পুডিংটা সম্বন্ধে কি একটা কথা বলিতে গিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। করুণা ঘরে নাই। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিলেন, কোথাও নাই। হঠাৎ মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হওয়াতে পা টিপিয়া টিপিয়া দক্ষিণের ঘরের খোলা দরজার কাছে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল। স্বদেশী ডাকাতটা চিত হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছে, আর তাঁহার আদরের কন্যা পাকা গিন্নীর মত তাহার শিয়রে বসিয়া চিরুনি দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইতেছে। যুগপৎ বিস্ময়ে এবং ক্রোধে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পান্নালালই প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা শয়তানী বুদ্ধিও যে তাহার মাথায় খেলে নাই, তাহা নয়। সে যেন মিসেস মিত্রকে দেখে নাই—এই ভাবে হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া করুণার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বলিবে ভাবিয়াছিল, আমরা স্বদেশী ডাকাত, হত্যার চাইতেও নিদারুণ, খুনের চাইতেও নির্মম, তোমার গয়না-গাঁটি যা আছে দিয়ে ফেল, দেশের কাজ, মায়ের—

কিন্তু প্রহসনটাকে আর বেশি দূর টানিতে ইচ্ছা হইল না। সে বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মাথা নীচু করিয়া ঘরের এক পাশে দাঁড়াইল। করুণা মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, মা, আমাকে মাফ কর। তাহার চোখে জল।

পাকা গিন্নীর মত শিয়রে বসিয়া চিরুনি দিয়া চুল আঁচড়াইতেছে

মা মেয়ে বাহির হইয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শুনিয়া মা বলিলেন, এদ্দিন বলিস নি কেন? বললে এত গোল হ'ত না। আর ওই বা এত গোঁয়ার-গোবিন্দ কেন, একেবারে বাড়ি চড়াও হয়ে জামাই হতে এসেছে?

অবনত মস্তকে আমতা আমতা করিয়া করুণা বলিল, ওই ওর কেমন বদস্বভাব মা, কোনও কাজই আর পাঁচজনের মত করবে না।

তা হ'লে তো ওর হাতে পড়লে কষ্ট পাবি তুই।

আমার স'য়ে গেছে মা।

এবারে মায়ের কথা জোগাইল না। প্রসঙ্গটা ঘুরাইবার

জন্য বলিলেন, তুই যা মা, পান্নালালের কাছে, আহা, বাছাকে কালকে একটা মশারিও দেওয়া হয় নি। এক কাপ চা খাবে কি না জিজ্ঞেস কর্।

এমন সময়ে কাটা টিকটিকির লেজের মত লাফাইতে লাফাইতে লাঠিহস্তে মিঃ মিত্রের প্রবেশ।—কোথায় সে হারামজাদা, দেখে নোব, আমার সঙ্গে চালাকি! রুবি—রুবি!

মিসেস মিত্র ততক্ষণে তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছেন, আঃ, কর কি? কাকে হারামজাদা বলছ? ও তোমার জামাই যে। বুড়ো বয়সে—

জামাই, না, তোমার মুণ্ডু! বাড়ি চড়াও হয়ে জামাই হতে আসবে? চাই না অমন—

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, চুপ কর, ওই ওর কেমন স্বভাব!

তিনি করুণার কাছে যেমন শুনিয়াছিলেন, ঘটনাটা স্বামীর কাছে বলিতে লাগিলেন। পান্নালাল ও করুণা ততক্ষণে আসিয়া মিত্র সাহেবের পায়ের ধূলা লইয়াছে। রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে মেয়ে ও ভাবী জামাইকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তা দেখ বাপু, তোমার চ্যালাকে বারিদবরণের ওখান থেকে—

পান্নালাল তাঁহার কথা শেষ হইতে দিল না, বলিল, আজ্ঞে, আমি এখনই যাচ্ছি।

ব্যঙ্গ-গল্প

ব্যঙ্গ গল্পের জন্য তাগাদা আসে, কিন্তু আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ লাগিয়াই আছে, সময় আর করিয়া উঠিতে পারি না। কাজ তো ছাই, প্রেসের প্রুফ দেখা আর কাগজ কালির যোগান দেওয়া। তবু কাজ তো বটে। দিবারাত্র মাথাটা এ-দুয়ারে ও-দুয়ারে ঠুকিয়া ঠুকিয়া এমনই নিরেট হইয়া গিয়াছে যে, কোনও ফাঁক দিয়া সেখান হইতে রস চোঁয়াইয়া পড়িবার কোনও সম্ভাবনাই নাই।

হরিশ খুড়োকে ধরিলাম। যৌবনকালে খুড়োর নামডাক ছিল, এ পড়তি বয়সেও খুড়ো যখন মজুমদারদের দাওয়ায় বসিয়া থাকিতেন, পাড়ার ঝিয়েরা বরঞ্চ কীর্তি মিত্রের লেন ঘুরিয়া কাজে যাইত, পারতপক্ষে খুড়োর নজরের ভিতর পড়িতে চাহিত না। বলিলাম, খুড়ো ব্যঙ্গ-গল্পের একটা প্লট দাও, বাঁচাও।

খুড়ো একগাল হাসিয়া বলিলেন, বাবাজী, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর সেই একটি গল্পই তো জানি।

বলিলাম, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী নয় খুড়ো, ব্যঙ্গ-গল্প, হাসির গল্প। গোপাল ভাঁড়ের নাম শুনেছ তো? তাই।

খুড়ো গালে হাত দিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন, সে সব তো বাবাজী ছাপার অক্ষরে চলবে না। আজকালকার দিনকাল যেমন—

বলিলাম, খুড়ো, পরশুরামের 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী'—

খুড়ো হুঁ হুঁ করিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, থাম থাম, ও নাম ক'রো না। ও হারামজাদীই তো আমার—

খুড়ো আর বলিতে পারিলেন না। থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অনেককাল খুড়োকে দেখিতেছি, সর্বদা হাসিখুশি ভাব, এ মূর্তি তাঁহার কখনও দেখি নাই। শঙ্কিত হইলাম, না জানিয়া খুব নরম স্থানে আঘাত করিয়া থাকিব।

বোকার মত চুপ করিয়া রহিলাম। হঠাৎ হরিশ খুড়ো বলিয়া উঠিলেন, জানিস ক্যাবলা, এ দুনিয়াটা ভাল মানুষের জায়গা নয়। উঃ! হারামজাদীকে আমি বুকের রক্ত দিয়ে গ'ড়ে তুলেছিলাম! চেয়ে-চিন্তে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তাকে খাইয়েছি, মশার কামড় খেয়ে খেয়ে দুর্গন্ধের মধ্যে তার গায়ে হাত বুলিয়েছি—

ব্যাপার কি, খুড়ো তাঁহার বাল্যজীবনের কিশোরী-ভজনের ইতিহাস শুরু করিবেন না তো? বাহিরে পৃথিবীসুদ্ধ লোক তাঁহাকে উদাসীন সন্ন্যাসী বলিয়া জানে, তাঁহার বৈরাগ্যের মূলে তবে কি এই কজ্জলী?

খুড়ো একটু দম লইয়াছিলেন, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কত দিন তার জন্মে আমি প্রতীক্ষা করেছি, কজ্জলী বড় হবে, দিন গুনেছি বললে ভুল হবে না। বউঠান কত ঠাট্টা করতেন, বলতেন, বিয়ে করলে না ঠাকুরপো, শেষে কি একটা অবলার পাল্লায় প'ড়ে জড়ভরত হবে? আমি শুনতাম আর হাসতাম।

হ্যাঁ, প্রতিদান কিছু চেয়েছিলাম বইকি। ছেলেবেলাতেই আখড়ার নিতে বৈরাগীর কাছে আফিং খেতে শিখেছিলাম, দিনান্তে সামান্য একটু স্নেহরস—

আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, খুড়ো, থাক্ থাক্, ও মর্মান্তিক অতীত কাহিনী আর নাই তুললেন।

দাওয়ায় তখন ভিড় করিয়া লোক জমিয়াছে। খুড়োর দুই চোখ কপালে উঠিল, আর্তনাদ করিয়া বলিলেন, মর্মান্তিক! হ্যাঁ, মর্মান্তিক বইকি, এত যত্নেও পাষাণীর মন পেলাম না।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তখনও গ্যাসের আলো জ্বলে নাই। আকাশে মেঘ ছিল, কলিকাতার আকাশে দুর্যোগ তেমন একটা ঠাহর হয় না, কিন্তু কেন জানি না, আমার মনে হইল, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি থমথম করিতেছে। সামনেই বোস-বাড়ির দোতলার নীচু বারান্দাতে আবছা ছায়ামূর্তিরা নিশ্চয়ই কান খাড়া করিয়া আছে, খুড়োকে ঘিরিয়া আমরা কয়েকজন শ্রোতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি।

খুড়ো কৌটা বাহির করিলেন। সন্তর্পণে খুব যত্নের সহিত একটি গুলি পাকাইয়া মুখে ফেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, কেবলরাম, কখনও ভালবেসেছ কাউকে? না না, বউমা নয়, আর কাউকে?

আমি নিরুত্তর। খুড়ো ধরা গলায় বলিতে লাগিলেন, যাকগে। হ্যাঁ, কি বলছিলাম— পাষাণীকে রাখতে পারলাম না। আমার সমস্ত স্নেহ-যত্নকে উপেক্ষা ক'রে, সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে সে একদিন মাঝরাত্রে চ'লে গেল। শহর নয়—পাড়াগাঁ, জানাজানি হতে দেরি হ'ল না। লণ্ঠন হাতে গভীর রাত্রেই তার খোঁজে বের হলাম।

ক্ষান্তবর্ষণ বর্ষারাত্রি, সূচীভেদ্য অন্ধকার। পথঘাট কাদায় দুর্গম, সাপের ভয়ও কম নয়। সমস্ত উপেক্ষা ক'রে সারা গাঁ তোলপাড় ক'রে খুঁজলাম। কোথায় পাব তাকে? মাঠ বন পার হয়ে সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে—

কে একজন প্রশ্ন করিল, ডাকাতে ধ'রে নিয়ে যায় নি তো? অথবা কারু সঙ্গে—? খুড়ো আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, না না, তা হ'লেও তো কিছু সান্ত্বনা পেতাম। হতভাগী আপনি পালিয়েছিল, কারু অপেক্ষা রাখে নি।

খুড়োকে ঘিরিয়া আমরা কয়েকজন শ্রোতা

তার পর?

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে হতাশ মনে ভোর-রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে শয্যায় দেহ এলিয়ে দিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, বেলা তখন দশটা। আমাদের খামারের মোড়ল হানিফ গাজী এসে খবর দিলে, ডাঙার ওপারে পীরপুরে তার সন্ধান পাওয়া গেছে। আমার যেন হাত পা আসছিল না। পীরপুরে তখন বাঘের উপদ্রব, জিজ্ঞেস করলাম, বাঘে মেরে ফেলে নি তো? হানিফ তার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। বললে, শয়তানীকে বাঘে খাবে কর্তা? পীরপুরের মোড়লদের সব্জিক্ষেতে সারারাত ডাটা

আর পালংশাক খেয়েছে, মোড়ল রেগে তাকে খোঁয়াড়ে আটক করেছে দেড়টি টাকা খেসারৎ দিয়ে ভরা দুপুরে তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। উৎসাহের সঙ্গে বলিয়া ', তা হ'লে

হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবাজী, আমার কাজলা গাই। কিন্তু এত ক'রেও বেটীকে রাখতে পারলাম না, বিশ সালের সেই বড় বানে একদিন রেতের বেলায় আবার বেটী বেরিয়েছিল, বানের জলে কোথায় সে ভেসে গেল, আজও তার সন্ধান করতে পারলাম না। সেই থেকেই আমি সন্ন্যাসী, মনের দুঃখে কলকাতায় এসে বাসা বেঁধেছি। তার কথা আর ভাবি না।

একটা হাসির রোল উঠিল, গ্যাসের আলো তখন জ্বলিয়াছে, দাওয়ার ভিড়ও কমিয়া আসিয়াছে, খুড়ো খুব গম্ভীরভাবেই প্রশ্ন করিলেন, হ'ল তোমার ব্যঙ্গ-গল্প ?

বলিলাম, হ'ল খুড়ো, কিন্তু বড় ছোট হ'ল।

সতীন-কাঁটা

যে মৎস্যটি পলায়ন করে, সেইটিই যে আকারে বৃহত্তর—এইটাই লোকে মনে মনে স্বীকার করিয়া লয়; কাঁদিতে না বসিলেও হাতছাড়া মাছটিকে লইয়া হা-হুতাশ করিবার প্রলোভনটুকু কেহ ছাড়িতে পারে না। আমাদের নিকুঞ্জবিহারীও তাহার প্রথম পক্ষের মৃত পত্নীকে স্মরণ করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রচুর তুলনামূলক সমালোচনা করিত এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়া বিরজাসুন্দরী অপেক্ষা প্রথমা মালতীলতাকেই সে বেশি নম্বর দিয়া ফেলিত। কিন্তু ইহা তাহার অন্তরতম প্রদেশের গুহ্যতম সংবাদ। বাহিরে সে আদর্শ স্বামী বলিয়া নিজেকে জাহির করিতে ছাড়িত না; এতটুকু সন্দেহ করিবার কোনও কারণ কোন দিন বিরজাসুন্দরীর ঘটে নাই, ঘটিলে নিরীহ নিকুঞ্জবিহারীর দুর্দশার অন্ত থাকিত না।

নিকুঞ্জবিহারী এমন সন্তর্পণে চলিত যে, বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত অন্য কেহ বড় একটা তাহার প্রথম বিবাহের সন্ধান রাখিত না। বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যেই প্রথম পক্ষ হঠাৎ গত হইবার পর নিকুঞ্জবিহারীর জীবন কেমন যেন এলোমেলো হইয়া যায়; স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করিয়া বসে যে, পৃথিবীতে কিছুতেই আর তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। শৌখিন বস্ত্রাদি, প্রসাধন-সামগ্রী ও এম. এ.র পাঠ্যপুস্তকগুলি নিঃশেষে পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া সে ঠনঠনের চটি পায়ে, রুক্ষ কেশে ও মলিন বেশে প্রত্যহ গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের তলায় গিয়া আকাশের তারা গুনিতে শুরু করে। নাওয়া-খাওয়ার ঠিক নাই, পড়াশোনা তো অনেক আগেই ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে চুরুট খাইত না, চুরুট খাওয়া ধরিল। চায়ের দোকানের একটি কোণ অধিকার করিয়া পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাইয়া যায় এবং হস্তস্থিত দৈনিক সংবাদপত্রের মার্জিনে কবিতার নোট লেখে। তাহার অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া তাহার বিধবা মাতা প্রমাদ গণিলেন ও পাড়ার পাঁচজন জানা-শোনা লোকের কাছে ইহার ঔষধের সন্ধান চাহিলেন। সবাই বলিল, প্রথমটা অমন হয়, আবার একটি বিবাহ হইলেই সমস্ত উড়ুউড়ু ভাব কাটিয়া গিয়া ছেলে সংসারে থিতাইয়া বসিবে। মা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় ছেলের কাছে কথা পাড়িলেন। ছেলে দৃপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিয়া কেবলমাত্র বলিল, ছি মা!—বলিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সেদিন গড়ের মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিকুঞ্জবিহারী ঘর সাজাইতে বসিয়া গেল। স্ত্রীর ফোটোখানি টেবিলের ঠিক মধ্যস্থলে রাখিয়া দিল ও তাহার স্মৃতিরঞ্জিত বস্তুগুলি

যাহাতে সহজেই নজরে পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিল। সমস্ত গোছগাছ শেষ করিয়া সে মৃত স্ত্রীর উদ্দেশে কবিতা লিখিতে বসিল।

কবি বলিয়া স্কুলের সহপাঠী-মহলে নিকুঞ্জবিহারীর খ্যাতি ছিল। 'কুজ্ঝটিকা' নামক মাসিকপত্রে তাহার একটি কবিতাও একবার বাহির হইয়াছিল। ইণ্টার্‌মিডিয়েট পাস করার পর মালতীলতার সহিত তাহার বিবাহ হয়। তখন হইতে সে কবিতা লেখা ছাড়িয়া পত্র-লিখনে দক্ষতা লাভ করে। সে বলিত, কবিতার মত ভাল চিঠিও সাহিত্যের অঙ্গ। স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া একটা 'ছিন্নপত্র' ছাপিবার মতলবও নাকি তাহার হইয়াছিল, চক্ষুলজ্জার খাতিরে ছাপাইতে পারে নাই। তবে ভবিষ্যতের জন্য সে তাহার ও তাহার স্ত্রীর চিঠিগুলি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। আজ বহুদিন পরে মায়ের কথায় তাহার সুপ্ত কাব্যাগ্নি ধিকিধিকি জ্বলিয়া উঠিল। স্ত্রীর ছবিখানির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সে ভাব ও মিল সংগ্রহ করিতে লাগিল। মা বার বার তাহাকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া ভয়ে ফিরিয়া গেলেন। নিকুঞ্জবিহারী মনের আবেগে সে রাত্রে আহার করিল না। প্রথমে একটি ছোট্ট সনেট লিখিয়া পরিষ্কার হস্তাক্ষরে সেটি নকল করিয়া সামনের দেওয়ালে টাঙাইয়া দিল। সেই ছোট কবিতাটিতেই তাহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। কবিতাটি এই—

অন্তহীন অন্ধকারে বসিয়া একেলা
অতীত দিনের কথা মনে মনে ভাবি,
লো মালতী, কেন খেলি দুদিনের খেলা
শূন্য করি খেলাঘর লাগাইলে চাবি!

তব ছবি অন্ধকারে মিটি মিটি হাসে,
বুকফাটা হাহাকারে আমি কাঁদি প্রিয়া,
বুঝি না কেমনে, যেবা যারে ভালবাসে—
তার হতে দূরে গিয়ে রহে গো বাঁচিয়া!

কে বুঝিবে মোর এই অন্তহীন প্রীতি—
সন্দিগ্ধ এ বিশ্বমাঝে সন্দেহিছে সবে;
আবার বিবাহ নাকি সংসারের রীতি—
শুন প্রিয়ে, সংসারের নই আমি তবে!

যেথা তব গতি প্রিয়া, মোর সেথা গতি,
তুমি বুকে বিরাজিছ শোভনা মালতী !

অতঃপর নিকুঞ্জবিহারী দীর্ঘ-ত্রিপদীছন্দে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগ অনেকখানি দমন করিয়া স্ত্রীর ফোটোখানি বুকে করিয়া শয়ন করিল।

ইহার পর কেমন করিয়া কি ঘটিল, জানি না। মাসখানেকের মধ্যে নিকুঞ্জবিহারী দ্বিতীয় বার দ্বারপরিগ্রহ করিল, এবং তাহারও মাস কয়েক পরে শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী তোড়জোড় করিয়া স্বামীঘর করিতে আসিল। নিকুঞ্জবিহারী তখন কাব্যমার্গে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে; নিজের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে কোনও বন্ধুর নাম দিয়া একটি সরল কবিতাও সে লিখিয়া ফেলিয়াছিল। সেই কবিতাটিতে প্রথম পক্ষের উল্লেখমাত্র ছিল না। কবিতাটির খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি—

সেই ভাল কর তবে বিয়ে—
নিদাঘ-নিশীথকালে থাকিতে না পার যদি
একটানা প্রাণখানা নিয়ে।
জ্যোছনা-যামিনী-ভাগে যদি ফাঁকা ফাঁকা লাগে—
সদা যদি হৃদে জাগে, হ'ত কত সুখ,
এ হেন সময়ে যদি জাগিয়া রহিত বুকে
একখানি কচি কচি মুখ—
টুকটুকে ছোট ছোট নধর অধর-কোণে
ঢলঢল একরাশি মধুহাসি নিয়ে;
সেই ভাল, কর তবে বিয়ে।
কোকিলের কুহুতানে প্রাণে যদি ব্যথা আনে,
গাহ যদি মনে মনে অভাবের গান,
জীবন কিছুই নয় সদা যদি মনে হয়,
করে যদি টলমল প্রাণ,
পড়ে যদি ফোঁটা ফোঁটা নিরাশার লোনা জল
উদাস আকুল ওই আঁখি-কোণ দিয়ে—
সেই ভাল, কর তবে বিয়ে।

· একটু অধিক বয়সে বিরজাসুন্দরীর বিবাহ হইয়াছিল। সে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, সতীন সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল এবং সতীন-সাহিত্যে গ্রাম্য ছড়া প্রভৃতি ও সখী-সমবয়সীদের সহায়তায় বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। স্বামীর মন যে স্বভাবতই প্রথম স্ত্রীর দিকে পড়িয়া থাকে, তা সে জীবিতই হউক, মৃতই হউক—এ কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল, এবং সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই সে আসিয়াছিল। স্বামীর শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়াই বিরজাসুন্দরী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল; প্রথম নম্বর চোখে পড়িল টেবিলের উপর ফোটোখানা, তারপরেই দেওয়ালে টাঙানো ছন্দোবদ্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাস; তারপর বাক্স-পেঁটরা পুঁথিপত্র ইত্যাদি। ভ্যাবাচ্যাকা স্বামীকে ভাবিবার অবসর না দিয়াই ধূলিলিপ্ত পদেই সে গৃহ-সংস্কারে মনোনিবেশ করিল। নিকুঞ্জবিহারী সগর্বে তাহার মাতাকে গিয়া জানাইল যে, নূতন বধূ ভারি গোছালো। ঘণ্টাখানেক পরে নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে সত্যসত্যই অবাক হইল এবং তখন হইতেই বুঝিয়া লইল যে, আর যাহাই করুক, দ্বিতীয় পক্ষের কাছে প্রথম পক্ষ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। টেবিলস্থিত ফোটোখানি অন্তর্হিত হইয়াছে। দেওয়ালে টাঙানো সনেটের টুকরাগুলি ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, এবং প্রথম পক্ষের সযত্নরক্ষিত বাক্স-পেঁটরাগুলি খাটের নীচে আত্মগোপন করিয়াছে। নিকুঞ্জবিহারীর বুক ধুকধুক করিতে লাগিল—তাহার বাক্স খুলিয়া দেখে নাই তো! সেখানে যে তাহার অতি-প্রিয় পত্রাবলী সযত্নে রক্ষিত ছিল! ফোটো ও সনেটের যাহাই হউক, এই চিঠিগুলিকে সে সত্যসত্যই ভালবাসিত। একবার ফাঁক পাইলেই সে এগুলিকে এমন করিয়া লুকাইয়া রাখিবে যে, বিরজাসুন্দরী কিছুতেই ইহাদের কোনও সন্ধান পাইবে না।

ঘর গোছানো শেষ করিয়া বধূ যখন স্নানাহার করিতে গেল, নিকুঞ্জবিহারী তখন অতীব সন্তর্পণে আপনার বাক্স খুলিয়া প্রথমটা হতাশ হইয়া পড়িল। বাক্স যে খোলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে;—চিঠিপত্রগুলির স্থানচ্যুতি ঘটিয়াছে, কিন্তু কিছুই খোওয়া যায় নাই: কারণ খোওয়া যাইবার মত চিঠি সেগুলি ছিল না। নিকুঞ্জবিহারীর সৌভাগ্য যে, সে তাহার প্রথমা পত্নীর পত্রগুলি একটি খাতার মধ্যে আঠা দিয়া আঁটিয়া রাখিয়াছিল। বাম ধারে তাহার চিঠি ও ঠিক ডান ধারে মালতীলতার উত্তরগুলি আঁটিয়া সে একটি খাতা সাজাইয়া রাখিয়াছিল, অবসর-সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য সে প্রায়শই এই পত্রগুলি পাঠ করিত। খাতা দেখিয়া বিরজাসুন্দরী কিছুই সন্দেহ করে নাই। নিকুঞ্জবিহারী তাড়াতাড়ি খাতাখানি সরাইয়া ফেলিল।

দ্বিতীয় পক্ষের সহিত অল্প কয়েকদিনের ব্যবহারেই নিকুঞ্জবিহারী বেশ বুঝিল যে, বিরজাসুন্দরী পতিপরায়ণা হইলেও কোমল ও ক্ষমাশীল নহে; তাহার মন যোগাইয়া না চলিলে, সে কুরুক্ষেত্র বাধাইতে জানে। স্বামীর ঘর করিতে আসার সপ্তাহখানেকের মধ্যে সে তাহার সতীনের সমস্ত চিহ্ন এমন নিঃশেষে গৃহ হইতে মুছিয়া ফেলিল যে, নিকুঞ্জবিহারীর মাতারই মাঝে মাঝে সন্দেহ হইত, বুঝিবা বিরজাই তাঁহার প্রথমা পুত্রবধূ। পাড়াপড়শীরা তো মালতীর কথা বিস্মৃতই হইয়াছে। শাশুড়ী ও প্রতিবেশীদের দিক দিয়া বিরজাসুন্দরী নিষ্কণ্টক হইলেও স্বামীর সম্বন্ধে তাহার বরাবরই কেমন একটা সন্দেহ জাগিয়া থাকিত। প্রথম প্রথম সতীনের ধ্যানপরায়ণ স্বামীকে সে প্রায়ই ধরিয়া ফেলিয়া লাঞ্ছনা করিত—মৃতার উদ্দেশেও মধুর বাক্য প্রয়োগ করা হইত না। নিকুঞ্জবিহারী মর্মান্তিক পীড়িত হইত ও চুপ করিয়া থাকিয়া পত্নীর রোষানলে আহুতি প্রদান করিত। সে এখন ভুলিয়াও মালতীর নাম করে না। বিরজাসুন্দরী ক্রমশ স্বামীর অনন্যনিষ্ঠায় বিশ্বাস করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে।

কিন্তু সেই গোপন পত্রগুলি রহিয়া গিয়াছে; বেনামীতে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশ করার কথা এখনও নিকুঞ্জবিহারীর মনে উঁকিঝুঁকি মারে। বিরজাসুন্দরী যখন নিশ্চিন্ত হইয়া শিশুপুত্রের চন্দ্রহার গড়াইতে ব্যস্ত, কবি নিকুঞ্জবিহারী তখন মালতীলতার স্বপ্ন দেখে। অলিখিত কাব্য মনের মধ্যে পাক খাইতে খাইতে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রকলত্র-পরিবৃত নিকুঞ্জবিহারী তাহার আদর্শ-পত্নীহারা হইয়া এখন বাদল-রজনীতে হাহাকার করে ও সুর করিয়া 'মেঘদূত' পড়িতে বসে। বিরজাসুন্দরী সন্দেহ করিবার আর অবকাশ পায় না; তাহার অনেক কাজ।

স্বর্গগত পিতার দৌলতে খাওয়া-পরার অভাব নিকুঞ্জবিহারীর ছিল না; তবু অবসর-যাপনের জন্য ও উপরি আয়ের আশায় একটা মার্চেন্ট অফিসে সে কাজ লইয়াছিল। একদিন সে তাহার অতি-প্রিয় 'পত্রাবলী'খানি সন্তর্পণে লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির করিয়া অফিসের দেরাজে চাবি বন্ধ করিয়া আসিল। শনিবারে দুইটার সময় অফিস বন্ধ হয়, সে খাতাখানি দেরাজ হইতে বাহির করিয়া সটান ইডেন গার্ডেনে গিয়া কোনও একটি বৃক্ষকুঞ্জে আত্মগোপন করিয়া 'পত্রাবলী' পড়িতে বসিল। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে অতীত দিনের সুখস্মৃতিগুলি তাহার ভাবাতুর চোখে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। দুই-একটি পাতা উল্টাইতেই তাহার চোখে পড়িল—

৫ নং চিঠি

সর্বস্ব আমার!!!

আমার মালতী, আমার লতা, তোমাদের ওখান হইতে এসে অবধি আমার জীবনের খেই হারাইয়া গেছে, কিছুই ভাল লাগে না—তুমি হয়তো হাসিবে, তুমি হয়তো তোমার "গঙ্গাজলে"র সঙ্গে আমাকে নিয়ে কৌতুক করিবে—তা কর, আমি আপত্তি করি না, কিন্তু আমার বুকের গুরুভার আমি কোথায় নামাই প্রিয়তমে! যাদিকে নিকট আত্মীয়-বন্ধু ব'লে গণ্য করতাম, তোমাকে বুকে পাইবার পরমুহূর্ত হইতে আর তাহাদের চিনিতে পারি না। কেন এমন হইল লতি?

আজ আমাদের বাড়ির ছাদ ছাইয়া জ্যোছনার বান ডাকিয়াছে, পাশের বাড়ির খাঁচায় পোরা কোকিলটার অশ্রান্ত কুহুধ্বনি আমার বুকের মাঝে হাহাকার তুলিয়াছে—তুমি কোথায়? দূরে একটা বাড়িতে এস্‌রাজের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোন্ বিরহী গাইছে—

ও মাধবী, ও মালতী
হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে
আমায় ব'লে দেবে কে—

আমার মালতী এখন কি করিতেছে আমায় কে বলিয়া দিবে? বসন্তশারদপূর্ণিমা-নিশীথের সমস্ত বিরহীকুলের ব্যথা আজ ঘনিয়ে উঠছে আমার মনে—রোমিও আজ জুলিয়েটের বাতায়নতলে করুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে হাঁকিয়া গেল, দ্বার খোল জুলিয়েট, আমি আসিয়াছি। জেসিকা আজ তাহার প্রিয়তমের সঙ্গে পিতার আশ্রয়নীড় ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছে; তুমিই কি কেবল অবাধে ঘুমাবে! ফুটফুটে হিমাক্ত জ্যোছনায় বিনিদ্র বুঝি কেবল একলা আমি—আমার মনে হচ্ছে সেদিনের কথা—যেদিন ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা ধরেছি তোমার মুখে—আর আজ কোথায় আমি, কোথায় আমার লতা—অনন্ত ব্যবধান।

তোমার পত্র না পাইলে পড়াশোনা করিতে পারি না। তুমি শীঘ্র উত্তর দিও। আমার বুকভরা স্নেহ ও — গ্রহণ করিও—ইতি

তোমার
আমি

৫ নং চিঠির উত্তর

বারুইপুর
C/o ডাক্তারবাবুর বাড়ি
ছকুরবেলা

শ্রীচরণেষু

দেখ তুমি অমন ক'রে আর আমায় চিঠি দিও না। তোমার চিঠি যখন এল, আমি তখন চান করছি—সেজদি চিঠিখানা নিয়ে খুলে, মায়ের কাছে আর বড় বউদির কাছে জোরে জোরে পড়তে লাগল, আমি তো লজ্জায় মরি! মাগো মা, তুমি এত আবোল-তাবোল লিখতেও পার,—গঙ্গাজল প'ড়ে হেসে খুন—বলে, তোর বর ভাই বেশ ছড়া কাটে। তুমি অমন ছড়া-টড়া আর কেটো না।

কাল বাবার কাছে মায়ের একখানা চিঠি এসেছে, তিনি আমাকে এই মাসেই নিয়ে যাবেন লিখেছেন। আমার ছোট ভাইয়ের ভাত হবে চোত মাসে, লক্ষ্মীটি আমি এ কদিন এখানে থাকব, মাকে ব'লে দিও। তুমি ভাল ক'রে পড়াশোনা ক'রো, ভাল পাস না দিতে পারলে সবাই আমাকে খোঁটা দেবে; সেজ জামাইবাবু এবার ডিপুটি হয়েছেন; সবাই তাঁর কত সুখ্যাত করে।

গঙ্গাজল তোমার বেশ একটি নাম দিয়েছে, শুনে তো হেসে বাঁচি নে। এত রঙ্গও জানে! নামটা কি শুনবে? নি—। না বাপু, আমি লিখতে পারি নে। আমার প্রণাম নিও ও মাকে আমার প্রণাম দিও। আজ তবে আসি,

ইতি শ্রীচরণের দাসী
মালতী

একটার পর একটা পাতা উল্টাইয়া যায়, আর তাহার কত কথাই না মনে পড়িতে থাকে! হায় রে, হাস্যলাস্যপরায়ণ মালতীলতা ও তাহার গঙ্গাজল! বারুইপুরে গিয়া ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকারও আজ তাহার নাই। নিকুঞ্জবিহারীর চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, মাথা গরম হইয়া গেল। খাতাখানি হাতে লইয়া সে সবেগে পায়চারি করিতে লাগিল। না, প্রিয়তমা প্রথমা পত্নীর এই স্মৃতিগুলিকে অক্ষয় করিয়া রাখিতেই হইবে, আজই এগুলিকে ছাপিতে দিব।—ভাবিতে ভাবিতে নিকুঞ্জবিহারী শ্যামবাজারের ট্রামে চড়িয়া বসিল।

খাতাখানি কোলের কাছে লইয়া ডিমাই না রয়াল, আর্টপেপার কিংবা অ্যান্টিক ভাবিতে ভাবিতে নিকুঞ্জবিহারী চলিয়াছে, হঠাৎ গোলদীঘির সম্মুখে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল ; চমকিয়া চাহিয়া দেখিয়াই তাহার বুকের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল ; যাদৃশী-ভাবনা যস্য—তাহার প্রথম পক্ষের সেজো ভায়রাভাই। সে সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া চলন্ত ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল।

গোলদীঘিতে একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া বহুদিন পরে নিকুঞ্জবিহারী একবার প্রাণ খুলিয়া মালতীর কথা বলিয়া লইল এবং পত্রাবলী ছাপাইবার গোপন অভিপ্রায়টুকুও ভায়রাভাইকে বলিতে দ্বিধা করিল না। পত্রাবলীর কথা উঠিতেই তাহার খেয়াল হইল যে, খাতাখানি সঙ্গে নাই। সর্বনাশ! কোথায় খাতা! নিশ্চয়ই ট্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে। বিহ্বল ভায়রাভাইকে কিছু বুঝিবার অবসর না দিয়াই সে ফুটপাথে আসিয়া একটা ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল এবং সোজা শ্যামবাজার ট্রাম-ডিপো অভিমুখে ট্যাক্সি চালাইতে বলিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; খাতাখানি পাওয়া গেল না। ট্রামের নম্বর জানা ছিল না। তারপর অনেক ট্রাম আসিয়াছে ; সন্ধান করিবার কোনও উপায় নাই। হায় রে, আজ কি কুক্ষণেই সে বাড়ির বাহির হইয়াছিল! কিন্তু খাতাখানি যে তাহাকে পাইতেই হইবে। অসুস্থ মন লইয়া নিকুঞ্জবিহারী সেদিন বাড়ি ফিরিয়াই শয্যা আশ্রয় করিল, বিরজাসুন্দরী ব্যস্তসমস্তভাবে কাছে আসিয়া প্রশ্নে প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল; নিকুঞ্জবিহারী বিরক্ত হইয়া বলিল, অফিসের একতাড়া দরকারী কাগজ সে ট্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে। সেগুলি না পাইলে সর্বনাশ হইবে। বিরজাসুন্দরী তাচ্ছিল্যভরে বলিয়া উঠিল, ও, এই, আমি বলি মাথা-টাথা ধরল বুঝি! তা এতে আর কি হয়েছে—খবরের কাগজে একটা লুটিস দিলেই কাগজ পাবে, তার আর কি! দাদার একবার—। নিকুঞ্জ-বিহারী লাফাইয়া উঠিল, ঠিক, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই তো হবে। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা দিলেই তো সর্বনাশ! অফিসের ঠিকানা দিতে হইবে!

নিকুঞ্জবিহারী 'অমৃতবাজার', 'ফর্‌ওয়ার্ড' ও 'আনন্দবাজারে' পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দিল ; অফিসের ঠিকানা দিতে ভুলিল না, লিখিল—"বিশেষ জরুরী কাগজপত্র—"

কাগজে বিজ্ঞাপন বাহির হইল, এক দিন দুই দিন করিয়া সাত দিন চলিয়া গেল ; কোনও উত্তর নাই। নিকুঞ্জবিহারী সকাল সকাল অফিস যায়, দেরি করিয়া বাড়ি ফেরে, কিন্তু ফল কিছুই হইল না ; পুরস্কারের লোভেও কেহ আসিল না। নিকুঞ্জবিহারী হতাশ হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, ও-জিনিস কি কেহ হাতে পাইলে সহজে ছাড়িবে!

হয়তো নিজের নামে ছাপাইয়া দিবে, তাহাকে কিনিয়া পড়িতে হইবে। ইহাকেই বলে গ্রহের ফের।

বিরজাসুন্দরী স্বামীর দুঃখে বিচলিত হয় ও নানা ভাবে তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। বলিল, সাহেবকে একটু ধরাধরি করিলেই আর কোনও গোল হইবে না; সাহেব হইলেও মানুষ তো!

কিন্তু নিকুঞ্জবিহারীর মন ভাঙিয়া গেল; অফিসে ছুটি লইয়া মা ও স্ত্রীর কাছে কাজের অছিলা দেখাইয়া একদিন সে বারুইপুর চলিয়া গেল; প্রিয়তমা পত্নীর বাপের বাড়ির আবহাওয়ায় মনটা একটু চাঙ্গা হইয়া উঠিতে পারে।

বিপদ যখন মানুষের আসে, তখন একেলা আসে না। মন সুস্থির করিতে নিকুঞ্জবিহারী যেদিন বারুইপুর গেল, তাহার পরের দিনই তাহার গৃহে একটি লোকের আবির্ভাব হইল—বলিল, বাবুকে তাহার বিশেষ প্রয়োজন, অফিসে খোঁজ করিয়া বহু কষ্টে বাড়ির সন্ধান করিয়া সে আসিয়াছে। বিরজাসুন্দরী দরজার অন্তরাল হইতে জিজ্ঞাসা করিল, বাবুকে তাহার কি প্রয়োজন? লোকটি ইতস্তত করিয়া বলিল, খবরের কাগজে—। বলিয়া সে একটি বাঁধানো খাতা বাহির করিল।

বিরজাসুন্দরী খুশি হইয়া চাকরকে বলিল, বাবুকে বসতে বল্।—বলিয়াই তাহার জলখাবারের আয়োজন করিতে গেল। খাতাখানি হাতে পাইলে স্বামীকে বেশ একটু জব্দ করা যাইবে, একটা কিছু আদায় করিয়া তবে সে খাতা দিবে, ইত্যাদি নানা চিন্তায় তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

লোকটিকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া বিরজাসুন্দরী চাকরের হাত হইতে খাতাখানি লইয়া নিশ্চিন্ত হইল। রান্নাঘরে তাহার কাজ ছিল, খাতাখানি শোবার ঘরে রাখিয়া সে কাজ করিতে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া সে খাতাখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল; এই সামান্য একখানা খাতার জন্য এত ভাবনা, এত ভয়! যাক, তবুও তো তাহার মত লইয়া চলিয়াছিল বলিয়া এটা ফেরত পাওয়া গেল, অথচ এরা নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবিয়া মেয়েদের পরামর্শ না লইয়াই চলিতে চায়!

খাতাখানি খুলিয়াই বিরজাসুন্দরী জ্বলিয়া উঠিল, অফিসের কাগজ, না, ছাই—এ যে বাংলা চিঠি, স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর! তাহার মাথা দপদপ করিতে লাগিল। ওমা, এ যে সতীনকে লেখা চিঠি; আবার সতীনের চিঠি! তাই এত মাথাব্যথা, এত দরদ! আসুক

একবার, কাগজে লুটিস দেওয়া বের করছি। রাগে সে খাতাখানা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

না, কি সব লেখা আছে পড়িয়া দেখিলে ক্ষতি কি! কেমন ভালবাসা ছিল দেখাই যাক না! বিরজাসুন্দরী খাতাখানা পড়িতে লাগিল। এক জায়গায় চোখে পড়িল—

···কবি লিখেছেন "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।" প্রিয়তমে, আমি মালাকর হতে চাই না, আমি ফুল হয়ে তোমার হৃদয়-লতিকায় বিকশিত হইতে চাই; তুমি আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে মালতী-প্রসূন হইয়া ফুটিয়া থাক।···

আর এক জায়গায়—

··কাল রাত্রে এক ভারি মজার স্বপ্ন দেখেছি—আমি আর গঙ্গাজল ঘাটে নাইতে গেছি, তুমি যেন নৌকো ক'রে এলে···

বিরজাসুন্দরী আর পড়িতে পারিল না; খাতাখানি কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। স্বামী আসিলে তাহার সাধের জিনিসগুলি উপহার দিতে হইবে।

সেদিন রাত্রে নিকুঞ্জবিহারী প্রথম পক্ষের শ্বশুরালয় হইতে অনেকখানি হালকা মন লইয়া ফিরিয়া আসিল। গঙ্গাজলের সহিত দেখা হইয়াছে, মালতীর নাম করিয়া সে কত কাঁদিয়াছে, শালীরা মাথার দিব্য দিয়া তাহাকে আবার যাইতে বলিয়াছে।

বিরজাসুন্দরী তখন শয়ন-ঘরে পান সাজিতেছিল। স্বামীকে দেখিয়াই সে উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধরিয়া ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটি ঝপ করিয়া স্বামীর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, এই নাও গো তোমার সরকারী কাগজপত্তর, খোকা ছিঁড়ে ফেলেছে।

তাহার সাধের খাতাখানির এই দুর্দশা দেখিয়া নিকুঞ্জবিহারী বসিয়া পড়িল। কে ইহার এই অবস্থা করিয়াছে, তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। হায় রে, ইহার চেয়ে খাতাখানি ফেরত না পাওয়াই যে ভাল ছিল। আর কেহ ছাপাইয়া দিলেও এগুলি টিকিয়া থাকিত তো। সে ফ্যালফ্যাল করিয়া একবার স্ত্রীর দিকে, একবার ছেঁড়া খাতাখানির দিকে চাহিতে লাগিল, একটি কথাও বলিতে পারিল না।

বিরজাসুন্দরী এখন নিষ্কণ্টক।

চিরকুমার

বিপত্নীক ললিত চাটুজ্জে আজ নিজেই বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে, একদা জিরাট-বলাগড়ের সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া কন্যা পূর্ণশশীকে বিবাহ করিয়া তিনি রামকৃষ্ণপুরে বিধবা মায়ের হাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। বাসর-ঘরে রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধে আত্মবিস্মৃতি হইয়া বালিকা পত্নীর গাল টিপিয়া আদর করিবার চেষ্টাও যে তিনি করেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাহার পর প্রায় বিংশ বৎসর অতীত হইয়াছে, সে সকল প্রায় স্বপ্নের মত মনে হয়।

অত্যন্ত পরিচিত বন্ধু ও আত্মীয়েরা ছাড়া সকলেই জানিত, আজীবন-কুমার ললিত চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, স্কুলে ছেলে ঠেঙানোর অবকাশে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স আলোচনা করিয়া থাকেন এবং মেসে ফিরিয়া সামনের বাড়ির মেয়েদের শুনাইয়া টেবিল বাজাইয়া কোনও দিন গান গাহেন না। বস্তুত, চিরকৌমার্যের জন্য সাহিত্যিক-মহলে এবং তরুণী পাঠিকা-মহলে কবি ললিত চাটুজ্জের খ্যাতি ছিল।

কিন্তু কৌমার্য-ব্রত ছিল ললিতবাবুর নিতান্ত বাহিরের রূপ। ফ্রয়েড সাহেবের শ্রেণীবিভাগে তিনি কোন্ শ্রেণীতে পড়িবেন, বলিতে পারি না। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হইলে তিনি স্কুলে যে কোনও শ্রেণীতেই পড়াইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

তাঁহার আক্রমণের পদ্ধতিটা একটু নূতন রকমের ছিল। সেভেন্থ ক্লাসে পড়াইতেছেন, বিনয় ছেলেটিকে তাঁহার ভারি পছন্দ; হঠাৎ তাহাকে একটা কঠিন প্রশ্ন করিলেন। বার কয়েক 'বল বল' বলিতেই সে ঘামিতে শুরু করিল এবং প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, পারব না সার্। ললিতবাবু তাহাকে কাছে ডাকিলেন এবং সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে পড়ার কথা না তুলিয়া তাহার বাড়ির খবর লইতে লাগিলেন। বাড়িতে কে কে আছে?

বাবা, মা, পিসীমা, দিদি।

দিদি? দিদি তোমায় পড়া দেখিয়ে দেন না?

না, সে নিজের পড়ার সময়ই ক'রে উঠতে পারে না সার্। তাকেই রান্না করতে হয় কিনা!

বেশ বেশ। তা তিনি পিঠে তৈরি করতে পারেন? নতুন গুড়ের পায়েস?

বিনয় খুশি হইয়া উঠে, বলে, হ্যাঁ সার্, চমৎকার পায়েস রাঁধে।

বেশ বেশ, তা একদিন আমাদের রেঁধে খাওয়াতে ব'লো। আচ্ছা যাও, এর পর যেন পড়া ভুল না হয়।

ইহার পরও পড়া হয়তো ভুল হয়, কিন্তু মাস্টার মশাইকে পায়েস খাওয়ানোর কথাটা বিনয় ভোলে না। বাড়িতে আবদার করিয়া বায়না ধরিয়া মাকে একদিন রাজী করায়। দিদি বলে, পাগল ছেলে, মাস্টার মশাই তোর সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন, তাও বুঝিস না? বিনয় বলে, না দিদি, মাস্টার মশাই খুব ভাল, তোমার কথা কত জিজ্ঞেস করেন। দিদি লজ্জিত হইয়া প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চায়। বিনয়ের মহা উৎসাহ, বলে, জান দিদি, মাস্টার মশাই কি চমৎকার ছড়া লেখেন, তাঁর অনেক বই ছাপা হয়ে বেরিয়েছে! দিদি পড়ার লোভে বলে, আনতে পারিস একদিন একটা বই চেয়ে? বিনয়ের আর তর সয় না, বলে, নিশ্চয়ই পারি—এখনই পারি।

বিখ্যাত কবি ললিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রেম-কাব্য 'মৃগশিরা' সুতরাং একদিন বিশেষ বিশেষ স্থলে চিহ্নিত হইয়া বিনয়ের মারফৎ বিনয়ের দিদির হাতে পড়ে এবং পায়েস খাওয়ারও নিমন্ত্রণ হয়।

মা দিদি আড়ালে থাকিয়া দেখেন, মা বেশিক্ষণ থাকিতে পারেন না, কার্যান্তরে যান। ললিতবাবু বিনয়কে জিজ্ঞাসা করেন, দিদি বই পড়েছেন? বিনয় দরজার আড়ালে দিদিকে প্রশ্ন করে। ইতিমধ্যে হয়তো বিনয়ের বাবাও একগাল হাসিয়া মাস্টার মশাইকে আপ্যায়িত করিয়া যান।

কবির বরাত কখনও খোলে, কখনও খোলে না। মাস্টারী জীবনের গত বারো বৎসরে প্রায় বিয়াল্লিশ জন প্রেমিকার সন্ধান এই ভাবে কবি ললিত চাটুজ্জে পাইয়াছেন। কখনও দিদি, কখনও দাদার শালী, কখনও পিসীমা, কখনও মাসী। ছাত্রেরা টপ টপ করিয়া পাস করিয়া মাস্টারের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, কিন্তু নব নব নায়িকার উদ্দেশে প্রণয়-প্রশস্তি লিখিতে লিখিতে কবি ললিত চাটুজ্জের কবিতার খাতা ভারী হইয়া উঠে।

এই গেল এক দিক। আর এক দিকে বিপত্নীক ললিত চট্টোপাধ্যায় সপ্তাহে একবার করিয়া নিজের জন্য পাত্রী দেখিয়া আসেন। আজ বারো বৎসর সপ্তাহে একটি করিয়া পাত্রী দেখিতেছেন, কখনও উলুবেড়েয়, কখনও গোবরডাঙায়। আমরা বলিতাম, কৃপণ ললিত চাটুজ্জে মেসের 'মীল' বাঁচাইতেছেন। পছন্দ তাঁহার আজ পর্যন্ত কাহাকেও হইল না।

পছন্দ হইবার কথাও নয়, যাহারা মৃগয়া করে, মৃগ পুষিতে তাহারা চাহে না। কিন্তু এসব খবর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া কেহ বড় একটা রাখিত না, সুতরাং চিরকৌমার্য-খ্যাতি তাঁহার অটুট ছিল।

ললিত চাটুজ্জের প্রেম-কাণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ের ইতিহাস দিতে গেলে দ্বিতীয় একটা মহাভারত লিখিতে হয়। আমরা ক্রমশ একটি একটি করিয়া তাহার পরিচয় দিব। কিন্তু সর্বাগ্রে বলিয়া রাখিতেছি—প্রেম-মৃগয়ায় বিখ্যাত শিকারী ললিত চট্টোপাধ্যায় কি ভাবে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া একদা শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। সেইখান হইতেই তাঁহার কৌমার্য-জীবনের ইতি হইয়াছে এবং তিনি স্কুলে পড়ানো ও পাত্রী দেখা—তুই কাজেই ইস্তফা দিয়াছেন। এই ঘটনার পর হইতেই তাঁহার নবজীবনের সূত্রপাত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী-সভা একবার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে 'মৃগশিরা'র কবি ললিত চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দিত করিলেন। কুমারী রেণুকণা মজুমদার তখন এম. এ. পড়িতেছেন, তিনি একটি প্রশস্তি-কবিতা পাঠ করিলেন এবং সভাশেষে বিনীতভাবে কবির নিকট আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, 'মৃগশিরা'র কয়েকটি কবিতার মর্ম তিনি ঠিকমত বুঝিতে পারেন নাই। সেগুলি বুঝাইয়া দেওয়া কি কবির পক্ষে সম্ভব? কবি পুলকিত হইলেন, কিন্তু স্থান ও কাল ঠিক কবিতা বুঝাইবার মত ছিল না। রেণুকণা যে হোস্টেলে বাস করেন, পরদিন ছিল সেখানকার ভিজিটার্স' ডে। স্থির হইল—কবি বেলা চারিটার সময় সেখানে উপস্থিত হইয়া কাব্যপাঠে রেণুকণার সহায়তা করিবেন।

সাজিয়া-গুজিয়া কবি হোস্টেলে উপস্থিত হইলেন। ভিজিটার্স' রূমে নানা বয়সের ও রূপের মেয়ে-পুরুষ গিজগিজ করিতেছে। আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের মত তুই বা ততোধিক সংখ্যা লইয়া এক-একটা স্বতন্ত্র পুঞ্জ এখানে ওখানে গুঞ্জনরত, কোণের দিকেই ভিড় বেশি। কলম ও বই লইয়া রেণুকণা আসিলেন; তুইজনে সামনা-সামনি তুই চেয়ারে বসিয়া কাব্যচর্চা শুরু হইল। হঠাৎ রেণুকণা বলিলেন, বড় গোলমাল, মাথায় কিছু ঢুকছে না। গঙ্গার ধারে যাবেন?

রেণুকণা অদ্ভুত, কবি হাতে স্বর্গ পাইলেন। তিনি এতকাল দূর হইতেই ভোগ করিয়াছেন, সুতরাং তুর্ভোগ তাঁহাকে বেশি ভুগিতে হয় নাই। কপাটের আড়ালে অথবা বাপ-মাকে সাক্ষী রাখিয়া উপভোগের মধ্যে উপভোগ যতটুকুই থাক্, বিপদ ছিল না। আনাড়ী ললিত চাটুজ্জে রেণুকণাকে সঙ্গে লইয়া ট্রামে চাপিয়া এবং হাঁটিয়া প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বেঞ্চগুলি অধিকার করিয়া অকবিরা বসিয়া আছে।

তাঁহারা রুমাল পাতিয়া ঘাসের উপরই বসিলেন। কবিতা-পাঠ শুরু হইল, কিন্তু খুব অধিক অগ্রসর হইল না। রেণুকণা হঠাৎ একটু কাত হইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, থাক্‌গে, ভাল লাগছে না। আচ্ছা, ললিতবাবু, আপনি কবিতা তো অনেক লিখেছেন, কখনও ভালবেসেছেন ?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন, ললিতবাবু ঘামিতে লাগিলেন, বলিলেন, তা—

রেণুকণা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, আপনি বড় নিষ্ঠুর ললিতবাবু। লক্ষ্য স্থির না ক'রেই আপনারা বাণ ছোঁড়েন, কখন যে কোন্ হতভাগা বাণে বিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে, ছটফট ক'রে মরে, তার কি খোঁজ রাখেন ? কবিতা লেখেন, বেশ করেন, কিন্তু ছাপান কেন ললিতবাবু ? না না, আর আমার সহ্য হয় না ললিতবাবু। আপনার সঙ্গ আমাকে পীড়া দিচ্ছে।

রেণুকণা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া দৌড়াইতে শুরু করিলেন। ললিতবাবু হতভম্ব হইয়া গেলেন, এখনও চব্বিশ ঘণ্টা হয় নাই ইহার সহিত আলাপ হইয়াছে, ইহারই মধ্যে ইহার পিছনে পিছনে ছুটিতে হইবে নাকি ? স্কুলের ছাত্রেরা হয়তো অনেকে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে আসে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হওয়াও আশ্চর্য নয়, তাহা ছাড়া সাপ্তাহিকের এডিটাররা কেহ ? না, ঝকমারি হইয়াছে। কিন্তু ওকি, ও যে জলের ধারে যায়, ডুবিয়া মরিবে নাকি ? ললিতবাবুও দৌড়াইলেন।

রেণুকণাকে অতি-আধুনিক বলিয়া পাঠকের মনে হইতেছে, লেখাপড়া-শেখা মেয়ের এতটা বাড়াবাড়ি—কিন্তু ইহার একটা ইতিহাস আছে। রেণুকণার এক বিশেষ বন্ধুকে পাত্রী হিসাবে ললিতবাবু দেখিতে গিয়াছিলেন। পাত্রী দেখিতে শুনিতে ভাল, কিন্তু ললিতবাবুর বিবাহ করা স্বভাব নয়, তিনি ওজর দেখাইলেন। রেণুকণা শুনিয়া ক্ষেপিয়া গেলেন, ললিতবাবুর সমগ্র ইতিহাস তিনি সংগ্রহ করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহার শোধ লইবেন। তিনি নিজে বাগ্‌দত্তা, নিজের কোনও স্বার্থের জন্য নয়, অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা তাঁহারই প্ররোচনায় এবং আজও গঙ্গার ঘাটে তিনি একা আসেন নাই।

ললিতবাবু যখন গিয়া রেণুকণাকে জড়াইয়া ধরিলেন, তখন রেণুকণার জুতা প্রায় গঙ্গার জল স্পর্শ করিয়াছে, অনেকটা ছুটিয়া রেণুকণা সত্যসত্যই ক্লান্ত হইয়াছিলেন এবং আধ-বিপুলকায় ললিতবাবুর জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। রেণুকণা মূর্ছাহতার মত ললিতবাবুর স্কন্ধে মাথা রাখিবার চেষ্টা করিলেন, এবং ফলে দুইজনেই গড়াইয়া জলের ভিতর

পড়িতেই খানিকটা কর্দমাক্ত জল ছিটকাইয়া তাঁহাদের চোখে মুখে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ের উপর হইতে কয়েকটি সমবেত কণ্ঠের অট্টহাসিতে গঙ্গার শান্ত তীরভূমি মুখর হইয়া উঠিল।

দুইজনেই গড়াইয়া জলের ভিতর

মর্মাহত ললিতবাবু উঠিলেন এবং কাদা ঝাড়িতে ঝাড়িতে রেণুকণাকে টানিয়া তুলিলেন। অস্ফুট কণ্ঠে রেণুকণাকে প্রশ্ন করিলেন, এখন উপায়? রেণুকণা হাসি চাপিয়া বলিলেন, উপায় আছে, এখন চলুন, হোস্টেলে ফিরি।

ফিটনে চাপিয়া কর্দমাক্ত দেহে দুইজনে যখন হোস্টেলে ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে, দরজার সামনেই দশ-বারো জন মেয়ে তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া ছিল। রেণুকণা গাড়ি হইতে নামিয়াই সহাস্যে বলিলেন, লেট মি ইন্ট্রোডিউস, ইনি আমার বন্ধু প্রীতিময়ী ব্যানার্জির ভাবী বর সুকবি ললিত চট্টোপাধ্যায়।

মেয়েরা কলহাস্যে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল।

যস্মিন্ দেশে

মহিম চাটুজ্জে প্যাঁকাটির মত শীর্ণ পা দুইখানি সবেগে আন্দোলিত করিতে করিতে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, আরে রাখুন মশাই, হ'লই বা সাহেব, খেলই বা গরু, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—এটা তো মানতে হবে। স্থান-মাহাত্ম্য ব'লে তো একটা কথা আছে!

হরগোবিন্দ মেলিন্স ফুডের শিশির নক্সা আঁকিতে ব্যস্ত ছিল। তেরছা চোখে চাটুজ্জে মহাশয়ের দিকে চাহিয়া উদ্গত হাসি গোপন করিয়া কহিল, যারা পাহাড় আর সমুদ্রকে শাসন ক'রে উড়ো জাহাজে চেপে সারা দুনিয়াটাকে লেভেল ক'রে ছেড়েছে মশাই, ভারতবর্ষে ব'সে লণ্ডনের টম্যাটো সসের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার গরুর হাড় যারা আকছার চিবচ্ছে, তাদের কথা আলাদা বইকি। তারা আপনাদের এই চটা-ওঠা চুন-বালি-খসা দেশের পাঁজি-পুঁথি মেনে চলবে কেন?

চাটুজ্জে মহাশয়ের মুখ ছিল উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে, টাইপিস্ট মিস টেবি ওই কোণটাতেই বসে, তাহার সহিত চোখাচোখি হইতেই চাটুজ্জের উত্তেজনা দ্বিগুণিত হইল। ডেস্ক চাপড়াইয়া ঘাড়টা ৭৫ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে বাঁকাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত হরগোবিন্দকে দেখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তিনি বলিলেন, আরে বাবা, আপিসটা তো আর শুধু ওরাই চালাচ্ছে না, এই চুন-বালি-খসা দেশের হতভাগ্য আমরাও তো আছি। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করতে হয়—দুটো দিন সবুর করলে কি এমন ভাগবৎ অশুদ্ধ হ'ত! তা না, এই ভরা পৌষ মাসে—

বোকা সাজিয়া লোক মজানো আর্টিস্ট হরগোবিন্দের পেশা; পেটে পেটে দুষ্টামি লইয়া এমন নিরীহ গোবেচারী ধরনের মুখ করিতে শিখিতে তাহাকে পাক্কা সাড়ে তিন বছর প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইয়াছিল, অন্তত সে নিজে তাহাই রটনা করে। দূর হইতে মিস টেরির প্রতি একটি প্রাণঘাতী নয়নশর ছাড়িয়া মহিম চাটুজ্জেকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল, দাদা ঠিক বলেছেন। আবার শুনছি নাকি নতুন আপিস-বাড়ি যে জায়গাটার ওপর হয়েছে, সেটা ছিল মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকে যত বনেদী মুসলমান ওমরাওদের কবরখানা। মামদো ওমরাও ভূতেরা—

ডিপার্টমেণ্টাল হেড গ্রিয়ার্সন সাহেবের জুতার মস্‌মস্ আওয়াজ শোনা গেল। হরগোবিন্দ কথা না থামাইয়াই বলিয়া চলিল, প্রোপোর্শনটা কি বিপিনবাবু, তিন বাই চার,

না, আট বাই দশ? শালা! মেজাজটা দেখলেন মশাই, মরবি ব্যাটারা। রাজত্বি কেড়ে নেওয়ার মজাটা এবার টের পাবি। ওমরাওরা কি আর সহজে ছাড়বে!

ননীগোপাল দেশপ্রেমিক, কিন্তু জুর্জুর ভয় দেখিতে দেখিতে মানুষ হইয়াছে বলিয়া ভূতকে তাহার বড় ভয়। হরগোবিন্দের কথায় সেও ভূতের ভয় ভুলিয়া লেজারের পাতায় ব্লটার চাপা দিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, ঠিক হবে, আমাদের সঙ্গে ওদের সাত শো বছরের পরিচয়, কটা চামড়াদের হাতের কাছে পেলে আমাদের কিছু বলবে না, কি বলেন হরগোবিন্দবাবু?

নূতন টাইপিস্ট মিস এলিসন সম্বন্ধে ক্যাশবাবু রতিকান্ত মিত্রের কিঞ্চিৎ দৌর্বল্য ছিল। তিনি কলমের ডগা দিয়া কান চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, তা হ'লে তো মিস এলিসনকেও—উঁহু, উল্টোডিঙির পীরের তাবিজ একটা তাকে পাঠাতেই হবে, জেনে শুনে তো আর এমন বিপদের মুখে—

টিফিনের ঘণ্টা পড়ে আড়াইটায়—ঘণ্টা পড়িতেই টিফিন-ঘরে গিয়া পৌষ মাসে বাড়িবদল সম্বন্ধে একটা রীতিমত আলোচনা করিবার প্রস্তাব হইল। অন্য ডিপার্টমেণ্টের বাবুদেরও পরামর্শ লইতে হইবে।

বিরাট অফিস—ষোলটা ডিপার্টমেণ্ট। কম করিয়া সাদায় কালোয় মিলিয়া নাহোক হাজার লোক এই অফিসে প্রত্যহ হাজিরা দেয়। শোনা যায়, প্রাচ্য ভূখণ্ডে দৈনিক খবরের কাগজের এত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আর নাই। ইংরেজ পরিচালিত ও সম্পাদিত 'ক্যাল্‌কাটা ক্রনিক্‌ল' ইংলণ্ডের যে কোনও দৈনিকের সহিত টেক্কা দিতে পারে। কোনও অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই—সমস্ত ব্যাপারটা ঘড়ির মত নিয়ম রাখিয়া চলে, এক চুল এদিক ওদিক হইবার জো নাই। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ—বাহিরের কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই। রয়টার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রিপোর্ট পাঠায়, টেলিগ্রাফ আসে, টেলিফোন আসে—নিজস্ব সংবাদদাতারা খবর পাঠায়, এডিটর সাব-এডিটরেরা লীডার লেখে, নিউজ এডিট করে, ঘরের আর্টিস্ট, ঘরের ব্লক, ঘরের টাইপ-কাস্টিং, ঘরেই রোটারিতে ছাপা—ঘণ্টায় কমসে কম পঞ্চাশ হাজার। বিকটাকার দৈত্যটা তেল মাখিয়া তৈয়ারি হইয়া বসিয়া থাকে, তাহার অনুচরেরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার আহারের আয়োজনে ব্যস্ত থাকে, হাতের কাছে সব আগাইয়া দেয়—ঘরের ভিত কাঁপাইয়া দৈত্যটা ঘণ্টাখানেকের জন্য গোঁ-গোঁ করিতে করিতে গা-ঝাড়া দেয়, পঞ্চাশ হাজার ফোঁটা ঘামের মত পঞ্চাশ হাজার কাগজ সকাল হইতে না হইতে সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে।

এমন ব্যবসা আর হয় না—মাটি ফুঁড়িয়া টাকা, ছপ্পর ফুঁড়িয়া টাকা। অভাব ছিল নিজেদের একখানা বাড়ির, ব্যাঙ্কের ব্যাল্যান্স কমাইয়া তাহাও সম্পূর্ণ হইয়া আসিল—একখানা সুবৃহৎ প্রাসাদ; চারতলা বাড়ি, তিনতলা মেশিন—একটা দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চারতলায় জেনারেল ম্যানেজার আপ্‌টন সাহেবের কোয়ার্টার—ভাড়াটে বাড়ি ছাড়িয়া এই বাড়িতেই উঠিয়া যাইবার আয়োজন চলিতেছিল।

টিফিন-ঘরের সভায় স্থির হইল, সকলে মিলিয়া বেশ নরম সুরে বড় সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে। ভাষাটা অনেকটা এই ধরনের হইবে—হুজুর, আমরা ছাপোষা গৃহস্থ লোক, দিন-ক্ষণ মানিয়া আমাদের চলিতে হয়—আপনারা দেবাশ্রিত, বিপদের আশঙ্কা আপনাদের নাই, কিন্তু আমাদিগকে অল্পেই বড় কাবু হইতে হয়। সুতরাং হুজুর, এই অল্প কয়েকটা দিনের জন্য আর কেন, একেবারে ২রা মাঘ তারিখে—

সেদিন সকালে সিলেটের এক চা-বাগানের ছোট সাহেবকে খুন করার সংবাদ আসিয়াছিল, আপ্‌টন সাহেব দরখাস্তটি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া হুকুম দিলেন, তাম্বু উঠাও। মুখে অভিশাপ দিতে দিতে ও ভিতরে ভিতরে কাঁপিতে কাঁপিতে বাবুরা নিজের নিজের ডেস্ক-ড্রয়ার গুছাইতে বসিলেন। হাতে কাজ না থাকিলেই আর্টিস্ট হরগোবিন্দ সহকর্মী বাবুবিবিদের পোর্ট্রেট অথবা ক্যারিকেচার আঁকিত। সেদিনও সে মিস টেরির একটা ছবি আঁকিয়া ফেলিল।

নূতন বাড়িতে সবাই উঠিয়া আসিয়াছে, মালপত্রও সব আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু তখনও গোছগাছ হয় নাই। নূতন রোটারি মেশিন নূতন বাড়িতেই বসিয়াছে, সুতরাং ছাপার কাজে কোনও বিঘ্ন হয় নাই। শুধু বত্রিশ বছরের পুরাতন দারোয়ান পক্ককেশ রামলেহড় সিং তখনও পুরাতন বাড়ির দেউড়িতে পাহারা দিতেছিল, তাহার চৌকা-বর্তন তখনও কালিঝুলি মাখিয়া পুরাতন বাড়ির দেউড়ি-ঘরে পড়িয়া। তাহার মনে সুখ ছিল না। এতদিন যেখানে সুখে দুঃখে কাটিয়াছে পরের বাড়ি হইলেও, তাহা ছাড়িয়া যাইতে তাহার বুকে বাজিতেছিল। সাহেবদের কি, বিদেশ হইতে আসিয়াছে, যেখানে খুশি থাকিলেই হইল! একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিতেছিল; রামলেহড় সিং ভয় কাহাকে বলে জানিত না, তাই তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। বিশেষ করিয়া হরগোবিন্দবাবু বলিয়াছেন, নৌতুন বাড়িতে একটু হুশিয়ারির সহিত থাকিতে, মুসলমান কবরখানায়

দীর্ঘশ্মশ্রুসমন্বিত জিনের সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎকার মোটেই অসম্ভব নয়। বুড়ী নানীয়ার কথা বুড়ার মনে হইতেছিল।

নূতন বাড়িতে তখন হৈ-হৈ ব্যাপার—ছোকরা সাহেব সাব-এডিটর আর বিজ্ঞাপন-বিভাগের ফচকে সাহেবেরা টাইপিস্ট মেমসাহেবদের সঙ্গে লইয়া এক-একটা খালি ঘরে ঢুকিয়া কড়িবরগা দেখিয়া দুই-চার মিনিট পরে পরে হাসিয়া বাহির হইতেছে, তাহাদের অট্ট ও চাপা হাসিতে নূতন বাড়ি মুখর—জেনারেল ম্যানেজার চারতলায় কোয়ার্টার সাজাইতে ব্যস্ত।

বাবুরা দুর্গানাম স্মরিয়া মনে মনে শ্রীগণেশ ফাঁদিয়া যে যাহার জায়গা সাজাইতেছে। হরগোবিন্দ ততক্ষণে মিস এলিসন ও রতিকান্তবাবুকে জড়াইয়া তিনটা কার্টুন আঁকিয়া ফেলিয়াছে—"তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে", "তোমায় দেখেছি হৃদ্-মাঝারে ওগো বিদেশিনী", "আমি আকাশে পাতিয়া কান"।

লেজার-কীপার অটলবাবু ঠিক সাড়ে তিনটার সময় এক পয়সার পকেট-পঞ্জিকা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, অপরাধ নিও না মা, অপরাধ নিও না উজির সাহেবরা, চাকরি বড় বালাই।

বিজ্ঞাপন-বিভাগ হইতে পরমেশবাবু হাঁকিলেন, কি হ'ল অটলবাবু?

অটলবাবু চিত হওয়া ছারপোকার মত চেয়ারে বসিয়া দুই হাত উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন, ত্র্যহস্পর্শ পড়ল কিনা, যদি কিছু হবার হয় এখনই হবে।

মেশিনটা গোঁ গোঁ আওয়াজ করিতেছিল, অটলবাবুর কথার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সকলের অজ্ঞাতসারে কান পাতিয়া সেই গোঙানি শুনিতে লাগিলেন। বিজ্ঞাপন-বিভাগের হেড গ্রিয়ার্সন সাহেব তাঁহার নিজস্ব ফোনটা ঠিক কোন্ জায়গায় বসাইলে জুৎসই হয়, সে বিষয়ে গবেষণা করিতে করিতে অটলবাবুর আর্তনাদ শুনিয়া ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে করিতে সেদিকে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ করিয়া মেশিনটা থামিয়া যাইতেই সেও থামিল। তিনতলার সিঁড়ি দিয়া বড় সাহেব দ্রুতবেগে নীচে নামিতেছেন দেখা গেল। চারিদিকে 'কি হইল, কি হইল' রব উঠিল; মিস বার্কমায়ারের ফিটের ব্যারাম ছিল। দেখা গেল, মিস টেরি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁপিতেছে। দেখিতে দেখিতে চার-পাঁচটা লম্বা লম্বা মোটরগাড়ি সদর-গেটের সামনে আসিয়া থামিল, মেশিন-ডিপার্টমেণ্ট বলিল, ইঞ্জিনীয়ার সাহেবরা আসিতেছেন। ব্যাপার কি? মেশিন-ঘরের পাথরের মত দেওয়াল চিড় খাইয়াছে। সর্বনাশ! মহিমবাবুকে সম্বোধন করিয়া হরগোবিন্দ বলিল,

দেখছেন দাদা, ওমরাওরা চুপ ক'রে নেই, কবরে নিশ্চয়ই তাঁরা পাশ ফিরছেন। মহিমবাবু ভুঁড়ি হইতে ময়লা গেঞ্জি তুলিয়া পৈতা হাতড়াইতে হাতড়াইতে কাঁপিতেছিলেন, হঠাৎ হরগোবিন্দকে একটা ধমক দিয়া বলিলেন, ইয়ার্কি ক'রো না ছোকরা, এটা ইয়ার্কির সময় নয়।

মিস এলিসনকে খুঁজিতে খুঁজিতে রতিকান্তবাবুর দৃষ্টি দেওয়ালের এক জায়গায় গিয়া থামিল, আঙুল বাড়াইয়া তিনি শুধু বলিলেন, ওই, ওই। সকলের দৃষ্টি সে দিকে নিবদ্ধ হইল। সে দেওয়ালেও ফাট ধরিয়াছে। অটলবাবু বলিলেন, তারা শঙ্করী, রক্ষা কর মা।

আধ ঘণ্টা হৈ-হৈ, তারপর সব চুপ। ডিপার্টমেন্টের সাহেবরা সর্বত্র টহল দিতেছেন। শোনা গেল, মেশিন চালু হওয়ার ফলে লেভেলে গোলমাল ঘটিয়া এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু গোখাদকদের আশ্বাস বাবুদের মনঃপূত হইল না। আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটিবে, এরূপ প্রত্যাশা লইয়া সেদিনের মত তাঁহারা বিদায় লইলেন।

রামলেহড় সিং ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। নূতন বাড়িতে নিশিযাপন করিবার জন্য সে দুইজন দেশওয়ালী ভাইয়াকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল।

* * *

পরদিন সাড়ে দশটায় হরগোবিন্দ অফিসে ঢুকিতেছে, রামলেহড় সিং ইশারা করিয়া তাহাকে ডাকিল। হরগোবিন্দ কাছে আসিলে তাহার কানে কানে বলিল, বাবুজী, উ লোক তো কাল রাতমে আয়া রহা। বৃদ্ধের মুখ চোখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি নিশ্চয় ঘুমায় নাই। হরগোবিন্দ শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, উজির লোক?

নেহি বাবুজী, উন লোককা আওরাৎ হোগা—রাত ভর রোতী রাহী, ঔর কল ঘরমে কাপড়া ধোতী রাহী, ঔর—

তোম দেখা?

দেখেগা কোন্ বাবুজী! দেখনেকা চিজ নেহী—শুনা হ্যায়।

হরগোবিন্দ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, পাঁড়েজী, তোম তো বাম্ভন হ্যায়—ক্যা পরোয়া?

মহিমবাবু রুমাল দিয়া ডেস্ক ঝাড়িতেছিলেন, হরগোবিন্দ ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, শুনেছেন?

নূতন কোন ইয়ার্কি মনে করিয়া মহিমবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, শুনব আবার কি?

শোনেন নি? তাঁরা কাল রাত্রে এসেছিলেন যে! আমাদের কলঘরে কাপড় কেচে গেছেন, আর সারা রাত্রি কেঁদেছেন।

মহিমবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, হরগোবিন্দের কাছে আসিয়া বলিলেন, কারা হে?

ওমরাওদের বেগমরা। প্রাণে বাঁচা দায় হ'ল মশাই, অনেক কাল তাঁরা না খেয়ে আছেন—

মহিমবাবু কাঠ হইয়া বলিলেন, যাও যাও, ইয়ার্কি ক'রো না। ওঁরা এখানে এসেছিলেন, তুমি বাড়িতে ব'সে টের পেলে, না?

বিশ্বাস না হয়, রামলেহড় সিংকে জিজ্ঞেস করুন।

ততক্ষণে কথাটা চাউর হইয়া গিয়াছে, রামলেহড় সকলের নিকট গোপনে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছে। রতিকান্ত কাঁধের চাদরখানা চেয়ারের হাতলে পাকাইতে পাকাইতে বলিল, প্রাণ নিয়ে চাকরি করা পোষাল না দাদা, অপদেবতাদের আসা-যাওয়া শুরু হ'ল।

শেয়ার-মার্কেটের রিপোর্টার ইংরেজীনবিস পি. ডি. ডাটো খাস ইংরেজীতে ব্যাপারটা মিস টেরিকে জানাইল; মিস টেরি খবর পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া খোদ গ্রিয়ার্সন সাহেবের কাছে তাহা নিবেদন করিয়া বলিল, হরগোবিণ্ড্ এই গল্প রটাইতেছে। হরগোবিন্দের প্রতি বরাবরই মিস টেরির নেকনজর ছিল।

একে মনসা, তায় ধূনার গন্ধ—গ্রিয়ার্সন গট গট করিয়া হরগোবিন্দের পাশে গিয়া জোর গলায় হাঁকিল, ওয়েল—

হরগোবিন্দ যেন কিছুই জানে না, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বিনীত ভাবে বলিল, ইয়েস সার্।

সাহেব মেঝেতে পা ঠুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হোয়াট আর ইউ আফ্‌টার? ফের যদি এসব আজগুবি গল্প রটাচ্ছ শুনতে পাই, তোমাকে ফায়ার—

হঠাৎ টপ করিয়া উপরের ছাদ হইতে এক ফোঁটা জলীয় পদার্থ হরগোবিন্দের মাথায় পড়িল। হরগোবিন্দ চমকাইয়া মাথায় হাত দিতেই থতমত সাহেব প্রশ্ন করিল, হোয়াট'স ছাট?

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া হরগোবিন্দ বলিল, অয়েল সার্।

অয়েল? সাহেব উপরের দিকে চাহিল, ব্লকঘরে অ্যাসিড আর গ্যাসের পাইপ মাথার উপর দিয়া গিয়াছে—গ্রিয়ার্সন সাহেব সেখানে দাঁড়াইল না। একেবারে বড় সাহেবের কামরার দিকে চলিয়া গেল। পনরো মিনিটের মধ্যেই তিন গণ্ডা লম্বা মোটরগাড়ি গেটে হাজির। ইঞ্জিনীয়াররা আসিলেন, বড় সাহেব আসিলেন, ছোট সাহেবরা উকিঝুঁকি

মারিতে লাগিলেন। অ্যাসিডের পাইপে লিক হইয়াছে। সকলের মুখ লাল, সকলের মুখ বিমর্ষ, হরগোবিন্দ খালি মাথায় হাত বুলাইতেছে। এমন হইবার কথা নয়। সাহেবেরা সকলে বড় সাহেবের কামরায় গেলেন, উড়ে মিস্ত্রী আসিয়া মইয়ে উঠিয়া বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে লিক সারিতে লাগিল। হরগোবিন্দ চোখ পাকাইয়া মিস টেরিকে দেখিতে লাগিল।

গতিক ভাল নয় ভায়া।—বলিয়া রতিকান্ত মিস এলিসনকে খুঁজিতে লাগিল।

বৈকালে আবার হুলস্থূল, ডেস্‌প্যাচ ডিপার্টমেণ্টের হেড লেকী সাহেব, ছয় ফুট নয় ইঞ্চি বিরাট চেহারা—ইয়া ছাতি। গায়ে কোট নাই, শার্টের আস্তিন গুটাইয়া ডেস্‌প্যাচ-ক্লার্ক হরিধনের কাঁধে হাত দিয়া হিড়হিড় করিয়া নীচে তাহাকে টানিয়া আনিতেছেন দেখা গেল। নীচের ঘরে পৌঁছিয়া চেঁচাইয়া সাহেব বলিলেন, কোথায় সে বেয়ারা, তাকে আইডেণ্টিফাই কর। হরিধন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছে। নূতন বাড়ি, অনেক বেয়ারা বদল হইয়াছে, নূতন বেয়ারাদের সকলকেই সে চেনে না। মাথা নীচু করিয়া কাজ করিতেছিল, কে তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া গিয়াছে, লেকী সাহেব তাহাকে ডাকিতেছেন। সে হাতের কাজ সারিয়া প্রথম বারে বিনীতভাবে সাহেবের কাছে গিয়া শুনিয়াছে, তিনি ডাকেন নাই। দ্বিতীয় বারেও সাহেবের মেজাজ ভাল ছিল, তিনি বলিয়াছেন, ভুল হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় বারে সাহেব ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। হরিধনকে যে কেহ ডাকিয়া দিয়াছিল, সে বিষয়ে সাহেবের সন্দেহ নাই ; কিন্তু কোথায় সে ?

উপরে বড় সাহেবের কামরাতেও এই ব্যাপার, নিউজ-এডিটর প্রফুল্ল সোম গোবেচারী মানুষ, তিনি তাহাকে লইয়া পড়িয়াছেন। কে তাহাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছে, সাহেব জানিতে চান। সে বেয়ারাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। চারিদিকেই বেয়াড়া ব্যাপার।

অফিসে সাহেব, ফিরিঙ্গী, হিন্দু, মুসলমান সকলের মনেই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে ; কোথায় কি একটা অঘটন ঘটিতেছে—কিন্তু কি ধরনের অঘটন, কেহ বুঝিতে পারিতেছে না। মিস টেরির অদ্ভুত মুখভঙ্গি দেখিয়াও হরগোবিন্দ সেদিন কার্টুন আঁকিতে পারিল না।

ছুটির সময় বড় সাহেব এক সার্কুলার জারি করিলেন, অফিসের কোনও কথা যেন বাহিরে প্রকাশ না পায়। ইহা লইয়া যে কেহ 'গসিপ' করিবে, তাহার চাকুরি থাকিবে না।

পরদিন রামলেহড় সিং যাহাকে পায়, তাহাকেই ধরিয়া বলে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখিয়া দিতে। বলিল, কাল রাত্রে বড় সাহেব পর্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। কি ব্যাপার? রাত্রি এগারোটার সময় তিনি নিজে বাহির হইতে গাড়ি হাঁকাইয়া হল-ঘরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন। একটু রঙিন হইয়া আসিয়াছিলেন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল, কিন্তু তিনি সহজে ভয় পাইবার পাত্র নন। রামলেহড় সিং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিয়া হুজুর? সাহেব স্থান কাল পাত্র ভুলিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, হল-ঘরের ঠিক মাঝখানে তিনি একটা চাদর-ঢাকা কাফন দেখিয়াছেন—মাটির উঁচু ঢিবিও হইতে পারে। এ বাড়িতে চাকরি করা রামলেহড় সিঙের পোষাইবে না। ছুটি না পাইলে সে ইস্তফা দিবে।

বড় সাহেব সমস্ত দিন নীচে নামেন নাই, ডিপার্টমেণ্টাল হেডদের নিজের কামরায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। লেকী সাহেবের খানসামা আসিয়া খবর রটাইল যে, সাহেব গান্ধীজীর এক তসবির ঘরে টাঙাইয়াছেন। সাহসী যাহারা, পা টিপিয়া টিপিয়া দেখিয়া আসিল, সত্যই গান্ধীজীর তসবির লেকী সাহেবের কামরায় টাঙানো হইয়াছে।

মহিমবাবু বলিলেন, তখনই বলেছিলাম দাদা,—একে পৌষ মাস, তায় কবরখানা, এখন ঠেলা সামলাও। পঞ্চাশ লাখ টাকা জলে গেল!

রতিকান্ত মিস এলিসনকে অফিসে আসিতে বারণ করিবার উপদেশ দিয়া এক চিরকুট লিখিয়া কেমন করিয়া তাহার নিকট পাঠাইবে ভাবিতেছিল, এমন সময়ে ক্যাশ সাহেবের কামরা হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধ উমাচরণবাবুকে আসিতে দেখা গেল। ছেষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ, আজ বিয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া 'ক্যাল্‌কাটা ক্রনিক্‌লের' হিসাব-বিভাগে খরচের ঠিক দিয়া আসিতেছেন—কখনও ভুল হয় নাই। নূতন বাড়িতে আসিয়া অবধিই নাকি তাঁহার ঠিকে ভুল হইতেছে—এক পাতার যোগ মিলাইতে যেখানে পাঁচ মিনিট লাগিত, সেখানে এক ঘণ্টাতেও গোল থাকিয়া যাইতেছে। তাঁহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। সাহেবের কাছে তিনি খোলাখুলি নিজের অক্ষমতা জানাইয়া আসিয়াছেন। সাহেব স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহারও 'কন্সেণ্ট্রেশন' আসিতেছে না, তিনি সর্বদাই কেমন একটা একটানা গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনিতেছেন, মেশিনের আওয়াজ নয়। যেন খুব নিকটে কোথায় কাহারা একসঙ্গে নামাজ পড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। বড় সাহেবও এই আওয়াজ শুনিয়াছেন, সই করিতে তাঁহার হাত কাঁপিতেছে। গোঁয়ারগোবিন্দ গ্রিয়র্সন সাহেব পর্যন্ত ভয় খাইয়াছে। এক লাইন টাইপ করিতে টাইপিস্টরা হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, তাহাতেও ভুল।

উমাচরণবাবুর কথা শুনিবামাত্র সকলেই কান পাতিয়া যেন সেই গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনিতে লাগিল—কেহ কথা বলে না। হরগোবিন্দ একটা মোটরকারের বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিতেছিল, সে মিস টেরির মুখ আঁকিয়া বসিল।

সাড়ে তিনটা বাজিতে তিন মিনিট বাকি—লেকী সাহেবের কামরা হইতে তর্জনগর্জন শোনা গেল—কোন্ হ্যায়, কোন্ হ্যায়, কে টুমি ?

সাহেবের কামরার দরজায় ভিড় জমিয়া গেল, দেখা গেল, লেকী সাহেব শূন্য দেওয়ালের দিকে চাহিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছেন। তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বড় সাহেবের কোয়ার্টারে লইয়া যাওয়া হইল। মদ নয়, লেকী সাহেব দিনে মদ খান না।

অফিস বুঝি আর টিকে না, সকলেই বিমর্ষ, 'ক্যাল্‌কাটা ক্রনিক্‌ল' অফিসের হাসি কোথায় উবিয়া গিয়াছে। হরগোবিন্দও হাসে না। সাহেবরা লজ্জিত হইয়া চলাফেরা করেন। দুই মিনিট অন্তর কাগজের রীল পট পট করিয়া ছিঁড়িতেছে—অনেক কাগজ একেবারে সাদা অবস্থায় মেশিন হইতে বাহির হইতেছে।

বেয়ারারা আর কাজে আসিতে চাহে না, কোন জায়গায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই তাহারা নাকি দেখিতে পায়, বিচিত্রবেশা স্ত্রীলোকেরা দেওয়ালের ভিতর হইতে, আলমারির মাথা হইতে, ছাপা কাগজের বাণ্ডিল হইতে তাহাদিগকে ইশারা করিয়া ডাকিতেছে। তাহারা সব করিতে পারে, কিন্তু দেশে জরু থাকিতে—। যাক, চাকুরির মায়াটাই বড় নয়।

একদিন শোনা গেল, বেচারা মিস বার্কমায়ারকে কে যেন তাহার বিশ্রাম-ঘরে চাপিয়া ধরিয়াছিল—তাহার প্রণয়-ক্ষিপ্ত চারী সাহেব নয়, কারণ চারী সাহেবের দাড়ি ছিল না। ফিটের গোঙানি শুনিয়া টেরি আর এলিসন গিয়া মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করে বটে, কিন্তু পরদিন হইতে মেমেরা আর কেহ অফিসে আসে না। রসের যেখানে যতটুকু 'স্কোপ' ছিল, ধীরে ধীরে সব কমিয়া আসিতে লাগিল। বাবুরা ভয়েই কাঁপিয়া মরেন শুধু। হরগোবিন্দ মডেল খুঁজিয়া পায় না।

রাত্রে মেশিন ও এডিটোরিয়াল ঘরে যাহাদের থাকিতে হয়, তাহারা যেন হাতে প্রাণ লইয়া কোনও রকমে কাজ সারিয়া যায়। কালো বিড়াল দেখিলে সাহেবরা [illegible] থাকেন, সাদা কাপড় দেখিলে বাবুরা মূর্ছা যান। গোঁ-গোঁ আওয়াজ শুনিলেই মেশিনম্যানরা 'ইয়া আল্লা' বলিয়া নামাজ পড়িতে বসিয়া যায়।

শেষে একদিন চরম একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। রাত্রি আড়াইটার সময় বড় সাহেব

আর নাইট-এডিটর সুধাকৃষ্ণবাবুকে জড়াজড়ি করিয়া বারান্দায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। দুইজনেই সংজ্ঞাহীন।

সুধাকৃষ্ণবাবুর বাড়ি হরগোবিন্দের পাড়ায়। হরগোবিন্দ শুনিল, সুধাকৃষ্ণবাবুর ঘোর জ্বর-বিকার, যায় যায় অবস্থা। হরগোবিন্দ তাঁহাকে দেখিতে গেল। সকালবেলা, জ্বর আছে, বিকার নাই। সুধাকৃষ্ণবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, রয়টার শেষ ক'রে সবে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে হাত দিয়েছি, রাত কটা হ'ল দেখবার জন্যে ঘড়ি দেখতে যাব। স্পষ্ট
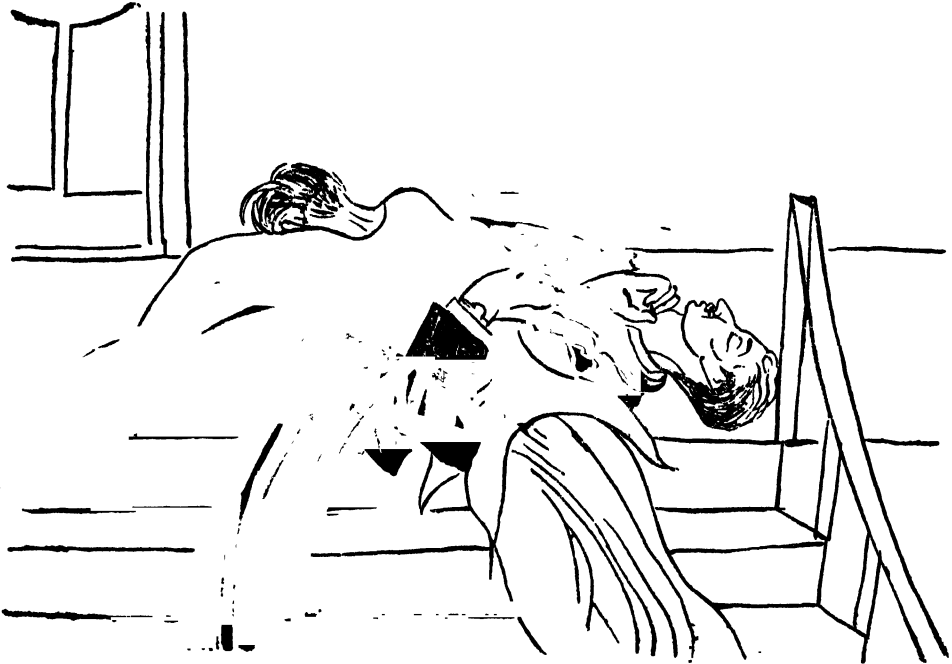
বড় সাহেব আর নাইট-এডিটর সুধাকৃষ্ণবাবুকে জড়াজড়ি করিয়া বারান্দায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল

দেখলাম, এডিটোরিয়াল ঘরের ঠিক মাঝখান দিয়ে এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত বোরখা-ঢাকা মূর্তি অনেকগুলো দাঁড়িয়ে আছে দুসারি। বোরখা-ঢাকা হ'লে কি হবে, যৌবন যেন সর্বাঙ্গ ফুঁড়ে বের হচ্ছে। ভুল দেখলাম মনে ক'রে পরীক্ষা করবার জন্যে উঠে সেখানে গেলাম, তাদের মাঝ দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলে কার সাধ্য! বললাম, মা সকল, ছেড়ে দাও, সিন্নি দোব। সবাই আরস্বরে বললে, সাহেবদের এখান থেকে যেতে বল, আমাদের কষ্ট হচ্ছে। রাত তখন আড়াইটে। বড় সাহেবকে উঠিয়ে এ কথা ব'লে এলাম। বড় সাহেব বললেন, ইউ আর ড্রাঙ্ক। সাহেবের হাত ধ'রে বললাম, মাইরি না সাহেব, দেখবে এস। সাহেবকে

ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে হ'ল না, মাঝপথ থেকেই তিনি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিলেন; তারপর কি যে হ'ল! জ্ঞান হ'লে দেখি, বাড়িতে শুয়ে আছি। হয়তো বাঁচব না। সাহেব ভাল আছেন তো?

এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত বোরখা-ঢাকা মূর্তি অনেকগুলো

হরগোবিন্দ মনে মনে বলিল, কে জানে! প্রকাশ্যে সুধাকৃষ্ণবাবুকে সান্ত্বনা দিয়া দোনামোনা হইয়া সে অফিস গেল। গেটে ঢুকিতেই রামলেহড় সিং বলিল, বাবুজী, জান নিয়ে পালাতে হ'লে এই সময়, এর পর—

অফিসে কোনও শৃঙ্খলা নাই; কাজকর্ম লেজার প্রুফ ফেলিয়া বাবুরা সব গোল হইয়া বসিয়া আছেন। হরগোবিন্দকে দেখিয়াই মহিম চাটুজ্জে চিঁ-চিঁ করিয়া

বলিলেন, এই যে ভায়া, মুখের হাসি গেল কোথায়? এদিকে তো আপিস উঠল। বড় সাহেবের হাই ফিভার, বিলেতে কেব্‌ল গেছে। ওয়াল্টার থার্স্টর্ন সাহেব আসছেন— স্পিরিচুয়ালিস্ট থার্স্টর্ন সাহেব হে।

রতিকান্ত বলিল, স্পিরিচুয়ালিস্টের কাজ নয় দাদা, বরঞ্চ উল্টোডিঙির পীরকে খবর দাও, সে একটা রাস্তা বাতলাবেই।

মেশিন চলিতেছিল, হঠাৎ তিন বার গোঁ-গোঁ শব্দ করিয়া তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। অতবড় বাড়িখানা অস্বাভাবিক রকম স্তব্ধ বোধ হইল। হরগোবিন্দ কি একটা দেখিয়া 'মা গো' বলিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিতে লাগিল।

পরদিন রামলেহড় সিং প্রচার করিল যে, সে স্পষ্ট দেখিয়াছে, সিঁড়ি দিয়া পাঁচজন খপসুরৎ আওরৎ পাজামা পরিয়া নীচের ঘর হইতে সেদিন রাত্রে বড় সাহেবের কামরার দিকে গিয়াছে। বড় সাহেবের কামরায় সমুচ্চা রাত মোগলাই ধরনের গান-বাজনা চলিয়াছে। বড় সাহেবকেও সে খাস উর্দুতে গান করিতে শুনিয়াছে।

বড় সাহেবের বিবি বিলাতে, আইন-বহির্ভূত আমোদ-আহ্লাদ করাটা তাঁহার পক্ষে দোষের নহে, কিন্তু অটলবাবু পকেট-পঞ্জিকায় শুভদিনের নির্ঘণ্টের পাতাটা খুলিয়া বলিলেন, সাহেবের কিন্তু হয়ে এল মহিমদা। অনেক দিনের বুভুক্ষা ওঁদের—। বলিয়াই সে দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল।

পরদিন দশটা হইতে ডিরেক্টরদের মীটিং বসিল। বড় সাহেব কোন রকমে যোগ দিলেন। বৈকালে হুকুম পাওয়া গেল, আবার তাম্বু উঠাইতে হইবে। পুরানো ভাড়াটে বাড়িটাই ভাল। থার্স্টর্ন সাহেবের আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কাজ নাই।

রামলেহড় সিংয়ের নৃত্য দেখে কে! কাপড়টা তাহার কোনও রকমে কোমরে জড়ানো ছিল। হরগোবিন্দ কার্টুন আঁকিয়া ফেলিল।

পুরানো মেশিনে ছাপা 'ক্যাল্‌কাটা ক্রনিক্‌ল' আবার বাজারে বাহির হইতে লাগিল। থার্স্টর্ন সাহেব আসিয়া নূতন বাড়ি দেখিতে গিয়া দিনের বেলাতেই এমন তাড়া খাইয়া আসিলেন যে, পরদিনই এয়ার মেলে বিলাতে যাত্রা করিলেন।

নূতন বাড়িটা ডিরেক্টররা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ওটা লটারিতে উঠাইতে হইবে, কুড়ি টাকা টিকিট, পৃথিবী জুড়িয়া টিকিট বিক্রয় হইবে। খরচ যে উঠিয়া আসিবে,

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহার ভাগ্যে উঠিবে, নূতন রোটারি মেশিনটাও তাহার হইবে, কিন্তু তাহার ভাগ্যকে 'ক্যাল্‌কাটা ক্রনিক্‌ল' অফিসের কেহ ঈর্ষা করিতেছে না।

এখনও লটারির টিকিট পাওয়া যাইতেছে। কবে লটারি হইবে, যথাসময়ে 'ক্যাল্‌কাটা ক্রনিক্‌লে' বিজ্ঞাপিত হইবে।

আবির্ভাব

গৃহিণী আসন্নপ্রসবা, সুতরাং গণৎকার দেখিলেই ডান হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলি, দেখুন তো।

কেউ বলে, ছেলে; কেউ বলে, মেয়ে।

দীর্ঘ নয় বৎসর ক্ষান্ত দিয়া গৃহিণীর এই নূতন উদ্যোগ—সমারোহও বলিতে পারেন, সর্বদাই তটস্থ আছি।

হিসাবমত দশ মাসও পার হইয়া যায়। ডাক্তার ডাকি, ধাই ডাকি। ফীয়ের টাকাগুলাই যায়, বলিবার বেলা তাঁহারা এক কথাই বলেন—যাহা বিনা ফীয়ে সকলেই বলিতে পারিত—সময় হয় নাই।

স্তিমিত চিত্তে সময়ের প্রতীক্ষা করি।

হোমিওপ্যাথি এবং জ্যোতিষে আমার জ্যেষ্ঠের সাতিশয় অনুরাগ, সুতরাং দেবদ্বিজে তিনি ভক্তিপরায়ণ। মাঝে মাঝে যোগের দুই-একটা কঠিন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া বউদিদির মনে গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হোমিওপ্যাথিক, জ্যোতিষিক এবং যৌগিক অধিকারে তিনি মাঝে মাঝে এমন ভাবে কথা বলেন যে, সেগুলি আপ্তবাক্যের মত শোনায়। দুইবার মেটিরিয়া মেডিকা এবং তিনবার গুপ্ত-প্রেস পঞ্জিকা আলোচনা করিয়া তিনি কিয়ৎকাল বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিলেন, অমুক আসছেন, কিন্তু কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর আগে তাঁর আবির্ভাব ঘটতেই পারে না। তিনি এককালে ঘোরতর পিঁয়াজ এবং মাংস খোর ছিলেন, সম্প্রতি ডিম পর্যন্ত ছাড়িয়াছেন, কাজেই তাঁহার কথায় প্রত্যয় হইতেছিল। কতকটা আশ্বস্তও হইয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে বন্ধুবর সরোজ একদিন সকালে উপস্থিত হইল। তাহারও ঘরে আসন্নপ্রসবা ঘরণী এবং সেই কারণেই নানাবিধ নির্যাতন সহিয়াও সে বাড়ি বদল করিতে পারিতেছে না। এক কাহন করিয়া নিজের দুঃখের কথাই সে শুনাইতেছিল। আমার কথাটা বলিলাম। ড্যাবা ড্যাবা চোখ করিয়া সে বলিয়া উঠিল, দশ মাস পেরিয়ে গেছে, বলিস কি? কোন্ মহাপুরুষ আসছেন, দেখ্। দুনিয়ার ঝক্কির কথা হয়তো স্মরণ আছে, ভুঁয়ে নামতে চাইছেন না।

সরোজকে কিছু বলিলাম না, কিন্তু কথাটা মনে ধরিল। পাড়ায় বিখ্যাত জ্যোতিষ-কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থকে গিয়া ধরিলাম। তেত্রিশ রকম লগ্ন তুঙ্গী রাহু রবির কথা আওড়াইয়া

ছক এবং আঁক কষিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে ঘাবড়াইয়া গেলাম। বেশি ঘাবড়াইলাম দক্ষিণার পরিমাণে, কিন্তু বিশেষ আলোক পাইলাম না।

একার সংসার; সমস্ত রাত্রি গৃহিণীকে তোয়াজ করতে করতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—"ওঁয়া ওঁয়া" শুনিয়া চমকিয়া জাগিয়া বসিলাম। সর্বনাশ, কি কাণ্ড এ! গৃহিণীকে পাশের ঘরে কে লইয়া গেল, ব্যথাই বা কখন উঠিল, নার্সকেই বা কে ডাকিল—কিছুই ঠাহর করতে পারিলাম না। দেখিলাম, সবই প্রস্তুত, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, প্রসূতি মূর্ছাপন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন। ডাক্তার ডাকিতে লোক ছুটিয়াছে।

নার্স বলিল, ভয় নেই, কেমন টুকটুকে ছেলে হয়েছে দেখুন।

ওষ্ঠাগ্রে একটা পার্লিয়ামেণ্ট-বিরোধী শব্দ আসিয়া পড়িয়াছিল; কষ্টে চাপিয়া গিয়া একটু বিরক্তভাবেই দেখলাম।

চমকাইতে হইল। সদ্যপ্রসূত শিশু চোখের ইশারায় কি যেন বলিতেছে—স্পষ্ট! অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

আবার! নার্সকে বিদায় করিতে বলিতেছে। শিশুকে কোলে লইয়া একটা ছুতা করিয়া নার্সকে বাহিরে পাঠাইলাম; শিশু কথা কহিল—সম্পূর্ণ এক অজানা ভাষা, পোস্ত পোস্ত বোধ হইল, কিন্তু সে এক মুহূর্ত, পরক্ষণেই স্পষ্ট বাংলা ভাষা—হে বাঙালী, তুমি ভাগ্যবান, আমি মুস্তাফা কামাল পাশা—তোমার ঘরে অতিথি হইয়াছি।

কোনও সৌভাগ্যবান পিতার এমন শোচনীয় অবস্থা হয় নাই; কোনক্রমে সামলাইয়া লইলাম। ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী মশায়ের কল্যাণে পুত্র কামালের আবির্ভাবে কবীর সাহেব যে দোঁহাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণে ছিল—

অহদ মুসাফির পহুন আয়া হ্যায়, ধরো মঙ্গল থার

বলিলাম, বৎস, আমি কৃতার্থ। কিন্তু তুমি যেন আরও কিছু চাও মনে হইতেছে।

আতাতুর্কীয় কণ্ঠে শিশু কহিল, ডাক্তারকে বারণ করিয়া পাঠাও। ডাক্তার যদি আনিতেই হয় বিধানকে ডাক। কিন্তু আমার নিতান্ত প্রয়োজন সুভাষকে। তাহাকে একবার সংবাদ দিতে পার?

চৌষট্টি টাকা ঘরে ছিল না। একটু ঘামিয়া উঠিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিলাম, কিন্তু—

মহাপুরুষ শিশু বুঝিল। বলিল, কামাল আতাতুর্কের নাম করিও, ফী লাগিবে না।

কিন্তু বিধান না হয় আসিলেন, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র কি আসিতে পারিবেন—

লেফ্‌টিস্ট কন্‌ফারেন্স লইয়া তিনি যেরূপ ব্যস্ত! সন্দেহটা শিশুর নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম।

যেন মেঘগর্জন হইল, সেইজন্যই সুভাষকে প্রয়োজন।

বাবার দায়িত্ব অনেক। শিশুকে মূর্ছিতা জননীর পাশে শোয়াইয়া ফোন করিতে গেলাম।

পশুপতিবাবুকে আসিতে বারণ করিয়া দিয়া বিধান-সুভাষকে ফোন করিলাম। তাজ্জব ব্যাপার; উভয়ে যেন এই আহ্বানের প্রতীক্ষায় ছিলেন। প্রশ্নমাত্র করিলেন না।

বিধানচন্দ্র প্রথমেই উপস্থিত হইলেন। আমি প্রবেশাধিকার পাইলাম না। বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র হাজির। ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কই তিনি?

আঙুল দিয়া ঘরের ভিতরটা দেখাইয়া দিলাম। বিধানবাবু সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া আমাকে নমস্কার করিলেন; বলিলেন, রাষ্ট্রপতির জন্যে একগাছি গোড়ে মালা আনিয়ে রাখা উচিত ছিল মশাই।

লজ্জিত লইলাম। বিধানবাবু পরক্ষণেই বলিলেন, থাক্‌গে, আপনি এতদিনে একটা কাজের মত কাজ করলেন মশাই। কিরণশঙ্করকে নিয়ে ও-বেলায় আসব। নমস্কার।

গর্বও একটু একটু হইতেছিল, বলিলাম, নমস্কার।

সুভাষচন্দ্র আঁতুড়-ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়াছেন। কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিলাম—বিশেষ কিছু মালুম হইল না। উত্তেজনার আতিশয্যে দরজাটা যখন একটু ফাঁক হইয়াছিল—হঠাৎ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, কামাল বলিতেছেন, ও দাসত্বের টুপিটা ছাড়। দেখিলে তো, কার্যকালে কাহাকেও বিশ্বাস করা চলে না। গান্ধীদের দিন গিয়াছে—রাইট লেফ্‌ট বুঝি না, তুমি ডিক্টেটরের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া রাখ। বাহিরে গণবাদের ধুয়াটা বজায় রাখিও। তাহাতে কাজ হইবে। আমি না আসা পর্যন্ত কৌশলে তোমাকেই সামলাইতে হইবে। তবে কোমলাঙ্গীদের প্রতি একটু কোমল হইও; উহাতে কার্যশক্তি বাড়ে।

পিতা আমি, লজ্জা হইল। দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলাম।

রাষ্ট্রপতি কিয়ৎকাল পরে বাহিরে আসিলেন। প্রশ্নার্ত মুখে তাঁহার দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন, তিন দিন পরে প্রেসে একটা বিবৃতি দিব। তত দিন পর্যন্ত গোল করিবেন না।

মাল্যহীন সুভাষচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

* * * *

ব্রজেনদার ডাকে চকিতে ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেশবন্ধু পার্ক প্রদক্ষিণের সময় হইয়াছে। ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল, তবু উঠিতে হইল। ব্রজেনদাও আতাতুর্ক কম নন।

গৃহিণীকে সেই দিনই বউবাজার পিত্রালয়ে পাঠাইলাম। ঠিক তিন দিন পরেই তিনি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। মহাপুরুষের মেয়াদ ত্রয়োদশী পর্যন্তও টিকিল না। আমার জ্যেষ্ঠ মর্মাহত হইলেন; আবার পিঁয়াজ ধরিবেন কি না চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"হিস্ট্রি রিপিট্স ইট্সেল্ফ্"—বৎসর দেড়েক পরে সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্রকে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া ইতিহাস পুনরাবর্তিত হইল। পর পর তিনটি কন্যার গৌরবান্বিত পিতা হইয়া আমি বায়োকেমিক চিকিৎসা ধরিলাম। আমার মর্মাহত জ্যেষ্ঠ কিন্তু ঘোরতর মাংসাশী হইয়া পড়িলেন।

হঠাৎ

কন্‌ফুসিয়াস-পূর্ববর্তী চৈনিক দর্শনশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, 'হঠাৎ' বস্তুটা যোগ নহে, বিয়োগ। স্থান কাল ও পাত্রের বিচিত্র সমন্বয়ে হঠাৎ কিছু ঘটা সম্ভব নহে; সমবেত বস্তু শক্তি ও বিষয়ের মধ্যে এক বা একাধিকের অন্তর্ধানেই "হঠাৎ"এর আবির্ভাব বা উৎপত্তি। এই বিয়োগ বা অন্তর্ধান স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে হাস্যকর, করুণ বা মারাত্মক হইতে পারে। চীনারা অত্যন্ত কম কথা বলে, ইঙ্গিতমাত্র দিয়াই চৈনিক দার্শনিক "হঠাৎ"-প্রসঙ্গের শেষ করিয়াছেন।

কাম্‌স্কাট্‌কার কবি-দার্শনিক কুচাহো সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেন। এই বিষয়ে চৈনিক মতাবলম্বী ব্লাডিভোস্টকের কবি বিথ্‌লোতলাচুংভিস্কির সহিত 'তেরপুন্‌-তাস্কি' (সান্ধ্য-সংবাদ) পত্রিকায় তাঁহার যে বৈজ্ঞানিক আলোচনা দীর্ঘকাল চলিয়াছিল এবং পরে যাহা 'বিস্তাসাং' (অর্থাৎ পয়জার) নামক সাপ্তাহিকে জঘন্য খেউড়ে রূপান্তরিত হইয়া শুচিবায়ুগ্রস্ত কাম্‌স্কাট্‌কীয়ান্‌দের ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল, সে সকলের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই; এইটুকু মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কুচাহো "হঠাৎ"কে যোগ বলেন, বিয়োগ নহে। চলিত (existing) বস্তু ও ঘটনা-সমন্বয়ে বহির্ঘটনা বা বহির্বস্তুর যোগ না ঘটিলে "হঠাৎ"এর উদ্ভব হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ধূমকেতুকে (পুচ্ছসমেত) "হঠাৎ"এর পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। তিনি বলেন, অনন্ত নভোমণ্ডলে সূর্য প্রভৃতি নক্ষত্রমণ্ডলী, শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি গ্রহ এবং চন্দ্রজাতীয় উপগ্রহ সর্বদা বর্তমান; এই চলিত বস্তু ও ঘটনা-সমন্বয়ে ধূমকেতুর যোগ ঘটিয়া "হঠাৎ"এর আবির্ভাব হয়। ফলে রাষ্ট্রে, সমাজে ও সাহিত্যে গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী।

জাপানীরা মুহুর্মুহু ভূমিকম্পপীড়িত, টাইফুনক্লিষ্ট, "হঠাৎ"ই তাহাদের নিত্য বর্তমান, সুতরাং "হঠাৎ" বলিয়া কোনও শব্দ তাহাদের অভিধানে নাই।

আর্কিমিডিস হইতে আইন্‌স্টাইন পর্যন্ত ইউরোপের বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় "হঠাৎ" লইয়া দীর্ঘ বাইশ শতাব্দী যে কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহা উত্তরোত্তর যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে হঠাৎ কিছু বলা উচিত হইবে না। কোন পক্ষই হঠিতেছে না, এবং পরস্পর তর্কবিচারের মধ্যে হঠকারিতা এরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে যে, মনে হয়, আর একটা মহাযুদ্ধ না ঘটিলে এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি হইবে না। ইউরোপকে আমরা বাদ দিতেছি।

আমেরিকায় "হঠাৎ"এর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত আছে, তাহা কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার; ইণ্ডিয়ার খোঁজে রেড ইণ্ডিয়ার সন্ধান হঠাৎ ঘটিয়াছিল; সুতরাং ইয়াঙ্কি অভিধানে "হঠাৎ" শব্দের অর্থে একটু ভুলের সংজ্ঞা জড়িত আছে। আমেরিকায় "হঠাৎ"এর হুল্লোড় যে পরিমাণ হয়, তাহাতে "হঠাৎ" লইয়া আলোচনা তাঁহারা বরদাস্ত করিবেন বলিয়া মনে হয় না, হঠাৎ কিছু একটা করিয়া বসিতে তাঁহারা ইতস্তত করেন না।

আফ্রিকার অরণ্য, পর্বত ও প্রান্তর নিবাসীদের মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র গরিলা হস্তী অজগর প্রভৃতি অতিকায় বন্য জন্তু হঠাৎ আবির্ভূত হয়, এইজন্য "হঠাৎ"কে তাহাদের বড় ভয়। ইউরোপ-আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদিগকেও তাহারা "হঠাৎ"এর পর্যায়ে ফেলিয়াছে।

কিন্তু প্রসঙ্গ দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। ভারতবর্ষের ঋষি বলিয়াছেন, সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম্—হঠাৎ কিছু করিবে না। ইহাতে প্রতীতি হয় যে, প্রাচীন ঋষিরা "হঠাৎ"কে যোগের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। যাহা চলিতেছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটানোই হঠাৎ কিছু করা; প্রচলিত মত ও রীতির ব্যতিক্রম কিছু না করিলে ঘটা সম্ভব নহে; সুতরাং কোনও ক্রিয়া বা ঘটনার উপর "হঠাৎ"এর নির্ভর।

হঠাৎ কিছু বলিতে চাহি না বলিয়াই আমাদের এই ভূমিকার অবতারণা, আসলে জীবনে আমরা "হঠাৎ"কে প্রাক্-কন্‌ফুসিয়াস চৈনিক ঋষিদের দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকি। যেমন ধরুন, ট্রেন ঝড়ের বেগে ছুটিতেছে, চাকা সরাইয়া ফেলুন কিংবা উহার গতিবেগ একেবারে বাদ দিন, কি ঘটিবে? যাহা ঘটিবে তাহা কল্পনা করিলেই "হঠাৎ"এর ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন। প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ ভাসিতেছে—তলদেশের খানিকটা অংশ সরিয়া গেল, হঠাৎ জাহাজডুবি হইবে। লিফ্‌টে চাপিয়া দ্বারভাঙা বিল্ডিঙে উঠিতেছেন, মাঝখানে বৈদ্যুতিক শক্তি অপসারিত হইল, আপনি না যাইতে পারিতেছেন কণ্ট্রোলার'স অফিসে, না নামিতে পারিতেছেন নীচে, সঙ্গে এম. এ. ক্লাসের একজন ছাত্রীও থাকিতে পারেন। লিফ্‌ট্‌ম্যান? আলোকরশ্মি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বেগে তাহার রেটিনায় অন্তত সে সময়ের জন্য ধাক্কা দিতেছে না।

সুবিমল দত্ত ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে কানাঘুষায় শুনিয়াছে, এই বৎসর এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজী বি-গ্রুপে প্রায় প্রত্যেক পেপারেই সে রেকর্ড মার্ক পাইয়া প্রথম হইয়াছে, একুনে প্রথম তো বটেই। সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য সে কণ্ট্রোলারের কাছে যাইতেছিল। খবরটা যে তাহার মনে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা নহে। তবু মা ভাবিতেছেন, দেশে তাঁহাকে খবর পাঠাইতে হইবে। মাটি হইতে মাঝপথে উঠিতে লিফ্‌ট বেশি সময়

লয় নাই, ইহারই মধ্যে সে অনেক কিছুই ভাবিয়াছে ; পড়াশুনা লইয়া বেশ ছিলাম, সে পাট তো চুকিল, এখন চাকুরির যোগাড়ে দরজায় দরজায় ঘুরিতে হইবে, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্টের চাকরি হয়তো একটা জুটিবে, হয়তো যত্ন করিয়া বি. সি. এস. দিলে ডেপুটিগিরিও জুটিতে পারে। কিন্তু ঘৃণার কথা বাদ দিলেও চাকরিতে তাহার বড় ভয়, কত রকমের লোকের সহিত কারবার করিতে হইবে! অথচ মামাদের স্কন্ধে আর চাপিয়া থাকিলে অন্যায় হয়, মা তো পাকাপাকি রকমেই সেখানে বাসা বাঁধিয়াছেন, তাহার পড়ার খরচও এতকাল মামারাই যোগাইয়া আসিয়াছেন, আর ভাল দেখায় না। চাকরি লইয়া মাকে কাছে আনিতে হইবে। প্রফেসারি চাকরিটা ভাল, ঝঞ্ঝাট কম, তাহার মনের মতও বটে, লেখাপড়া লইয়াই থাকিতে পারিবে। এদিকে মা আবার বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করিয়াছেন, পাত্রীও নাকি দেখিয়াছেন অনেকগুলি, একটিকে তাঁহার পছন্দ হইয়াছে, মায়ের কাছে গিয়াই তাহাকে পাত্রী দেখিতে ছুটিতে হইবে।

তেতলা কিংবা চারতলা হইতে কে যেন বেল টিপিতেছিল, ক্রিং ক্রিং করিয়া দুই বার ঘণ্টা বাজিয়াই চুপ, ঘড়াং করিয়া মাঝ রাস্তার লিফ্‌ট থামিয়া গেল, কারেণ্ট বন্ধ হইয়াছে। আচমকা একটা ধাক্কার মত, অন্যমনস্ক সুবিমল বিহ্বলভাবে চাহিয়া দেখিল, তাহার সহযাত্রী একজন মেয়ে, এতক্ষণ সে তাহাকে লক্ষ্যই করে নাই। হঠাৎ লিফ্‌ট থামাতে সে প্রায় তাহার ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে।

অপ্রস্তুত সুবিমল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কি করা উচিত, ঠিক করিতে না পারিয়া বিনীতভাবে শুধু একটি নমস্কার করিল।

বড় গরম, লিফ্‌ট্‌ম্যান সুদ্ধ ভ্যাবাচাকা খাইয়া ঘামিয়া উঠিয়াছে, হাতল ধরিয়া এদিকে ঘুরাইতেছে, ওদিকে ঘুরাইতেছে; কিন্তু বিকল কল কথা বলে না, নড়ে না। চারিদিকে দেওয়াল, আলোহীন অন্ধকার।

মেয়েটি কথা বলিতে চেষ্টা করিল। সুবিমলকে সে চেনে, বিদ্যাসাগর কলেজে একসঙ্গে বি. এ. পড়িত, ফেল করিয়া এক বৎসর পিছাইয়া পড়িয়াছে। নাম কল্যাণী সোম। গানের বাজারে নাম আছে। সুবিমল চোখ তুলিয়া সহপাঠিনী মেয়েদের কখনও দেখে নাই, সুতরাং অন্য সকলের মত কল্যাণীও তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্টকে চেনা অসঙ্গত নয়।

কল্যাণী কথা বলিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল শুধু, সুবিমলবাবু!

ত্রিশঙ্কুর মত আকাশের মাঝখানে অবস্থিত সুবিমল যেন আকাশ হইতে পড়িল। তাহার অবাক হওয়ার ভাব দেখিয়া কল্যাণী ততক্ষণে সাহসী হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, আশ্চর্য, আপনি আমায় চেনেন না দেখছি, বিদ্যাসাগরে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। আমার নাম কল্যাণী।

স্মৃতিভ্রংশ হইবার পর মানুষ প্রথম যখন অস্পষ্টভাবে পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইতে থাকে, সেই ধরি-ধরি-ধরিতে-পারি-না অবস্থা হইল সুবিমলের। একবার নজর দিয়া কল্যাণীকে দেখিল।

কল্যাণী সোম? ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে—

লজ্জা হইল কল্যাণীর, মুখ নীচু করিয়া প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্যই বলিল, আপনি তো এবারে রেকর্ড—

কিন্তু ব্যাপারটা কি? গরমে ও অন্ধকারে দম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল যে! আলো নিবিবার জন্য চারিদিকে কোলাহল শুরু হইয়াছে, বারান্দায় ও প্যাসেজে সকলে হল্লা শুরু করিয়াছে, পাঁচ মিনিটের উপর হইল কারেণ্ট ফেল করিয়াছে।

লিট্‌ল সাহেব এবং অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন, অন্ধকূপহত্যা নিছক গল্পমাত্র। জোর করিয়া সুবিমল কিছু বলিতে পারে না, ইতিহাসের ছাত্র নয় সে; কিন্তু ঐরূপ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। মিস কেরী নাকি বাঁচিয়া ছিলেন, কল্যাণীও বাঁচিয়া থাকিবে; কিন্তু সে মরিতে বসিয়াছে।

আর সোজা দাঁড়াইয়া থাকা যায় না, লিফ্‌টের একটা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিলে কি রকম হয়! কিন্তু একি, কল্যাণী যে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, মূর্ছা গেল নাকি?

লিফ্‌ট্‌ম্যান ধরিতে যায়—এ অবস্থাতেও সুবিমলের ততটুকু ক্ষাত্রবীর্য ছিল, সে একবার গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল এবং কল্যাণীকে পিঠে একটা কোমরে একটা হাত দিয়া শূন্যে তুলিতে চেষ্টা করিল।

হঠাৎ—

কিন্তু এবার যোগ। অবিরাম বিদ্যুৎপ্রবাহ, আলো, পাখা, ক্রিংক্রিং—কোলাহল। লিফ্‌ট্‌ম্যানের দিকে চাহিয়া সুবিমল শুধু বলিল, নীচে নামাও।

অধোগামী লিফ্‌টের মধ্যে সুবিমলেরও মনে হঠাৎ কেমন গোলমাল বাধিয়া গেল; কল্যাণীকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া সে যখন বাহিরের কম্পাউণ্ডে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনই সর্বপ্রথম তাহার খেয়াল হইল, স্থানটা ইউনিভার্সিটি এবং তাহারা উভয়ে ঠিক

সাধারণ অবস্থায় নাই। পা হড়কাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার চিহ্ন উভয়ের সর্বাঙ্গে। দূরে কম্পাউণ্ডের মাঝখানে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া হয়তো কল্যাণীরই দুইজন সহপাঠিনী; এই অবস্থায় তাহাদের দেখিয়া ঠিক যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে, তাহা মনে হইল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুবিমল ঘামিতে লাগিল।

আঃ!—বলিয়া কল্যাণী চোখ খুলিল, এ কি, আমি কোথায়?

হঠাৎ—

লজ্জা আসিয়া তাহার ক্লান্ত মুখখানিকে রাঙাইয়া দিল। সুবিধা থাকিলে মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিত। ক্ষীণ কণ্ঠে শুধু বলিল, আমার শরীরটা কেমন করছে, বাড়ি পৌঁছে দেবেন আমায়?

রেজাল্ট-লোলুপ সহপাঠীরা তো ছিলই—ফিফ্‌থ ইয়ার, সিক্‌স্‌থ ইয়ার, ল ক্লাস, কেরানী—ভানুমতীর খেলা দেখিতেও মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে এত লোক চট করিয়া জড় হয় না। সুবিমল মালকোঁচা মরিল।

সহানুভূতি, হাসি, উপহাস—প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীটের মুখ পর্যন্ত—মেরিয়াসকে কাঁধে তুলিয়া জিন ভল্‌জিন (জাঁ ভাল্‌জাঁ লিখিতে সাহস হয় না) প্যারিসের সুড়ঙ্গপথে চলিতে এতখানি কষ্ট পায় নাই, কল্যাণী কিন্তু নিজেই হাঁটিয়া চলিয়াছিল।

ট্যাক্সি!

মোড়ে মোড়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হওয়ার ব্যাপার লইয়া গুলতানি চলিতেছে। দুপুর না হইলে দুই-একটা ডাকাতির খবরও হয়তো এতক্ষণ বাজারে ছড়াইয়া পড়িত। কিন্তু সুবিমল ইংরেজী কাব্য পড়িয়াছে, অথচ মোটে কল্পনাপ্রবণ নয়। আকস্মিক এবং অভাবনীয় ঘটনা তাহার মনে কোনও রসসৃষ্টিই করিল না। বাইনোমিয়াল থিওরেমের মত অতি সংক্ষেপে সে প্রশ্ন করিল, কেমন বোধ হচ্ছে? এইবার বাঁয়ে যাব তো?

অসুস্থ অবস্থাতেও কল্যাণীর কি বাঁয়ে বসিতে ইচ্ছা হইতেছিল? ভাল ছেলে, চেহারাও নিন্দার নয়। চোখে চশমা পর্যন্ত নাই; তা ছাড়া এমন নাইভ অ্যাণ্ড আন্‌অ্যাসিউমিং—বাংলা বিশেষণগুলা গালির মত শুনায়, একবার ডিক্সনারি দেখিতে হইবে।

মেজো কাকা বৈঠকখানার ফরাশে তাকিয়া হেলান দিয়া পেশেন্স খেলিতেছিলেন, দুই-তিন বৎসরের আধ-উলঙ্গ একটি শিশু তাঁহার পাশে উপুড় হইয়া ঘুমাইতেছিল; ভিতরের বারান্দায় মা হরিমতী ঝিয়ের সঙ্গে বঁটিতে তেঁতুল ছাড়াইতেছিলেন। কল্যাণী
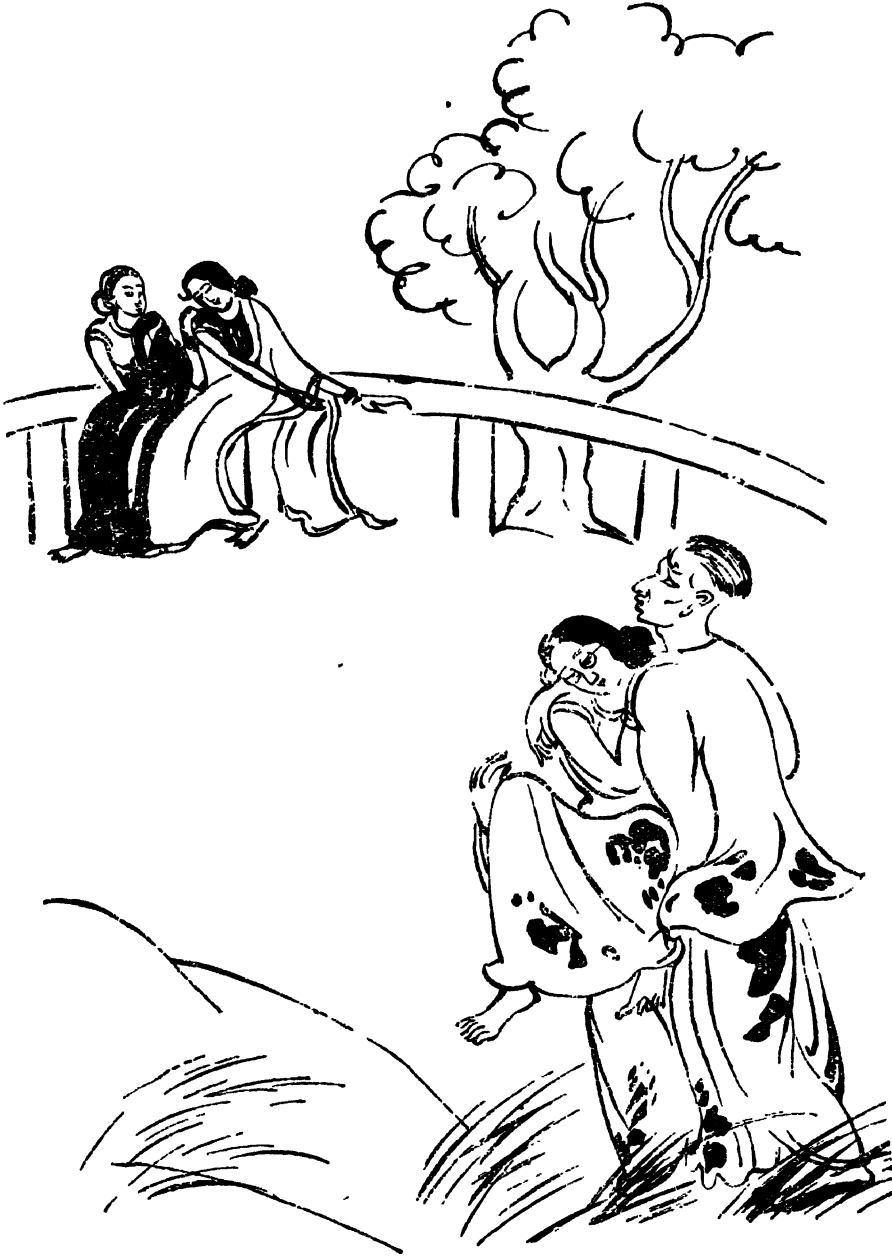
দূরে কম্পাউণ্ডের মাঝখানে একটা বেঞ্চিতে বসিয়া হয়তো কল্যাণীর দুইজন সহপাঠিনী

কলেজ হইতে ফিরিয়া সুজির রুটি খায়, পাশে তোলা-উনানে অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে সুজি সিদ্ধ হইতেছিল।

দরজায় ট্যাক্সি থামিতেই মেজো কাকা ভ্রূকুটি করিলেন, হরতনের সাটটা প্রায় মিলিয়া আসিয়াছিল, এ সময়ে কাহারা আবার জ্বালাইতে আসিল!

সুবিমলই ভাড়া দিল, কল্যাণী তখনও ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, দাঁড়ান, মায়ের কাছ থেকে আসি—

মেজো কাকা হাঁকিলেন, কে রে, রাণী না? এত সকাল সকাল যে! ট্যাক্সিতে কে এল রে?

কল্যাণীর পিছনে পিছনে সুবিমল বৈঠকখানায় ঢুকিল। তাসগুলি দুই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া মেজো কাকা বিস্মিতভাবে কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিলেন। কল্যাণীর লজ্জা যেন দ্বিগুণ হইয়া আসিল, সহসা কোনও জবাব না দিয়া সে মেজো কাকার পাশে শায়িত ঘুমন্ত শিশুকে কোলে তুলিয়া নাচাইতে শুরু করিল এবং একটু দম লইয়া হাসিতে হাসিতে সুবিমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার দিদির ছেলে, আর ইনি মেজো কাকা।

সঙ্কুচিত সুবিমল বিনীতভাবে নমস্কার করিল, ইত্যবসরে দিদির ছেলের গালে একটা কামড় দিয়া তাহাকে জাগাইতে চেষ্টা করিতে করিতে কল্যাণী বলিল, ইনি সুবিমলবাবু, এবার এম. এ.তে ইংরেজীতে ফার্স্ট হয়েছেন।—বলিয়া সে আজিকার লিফ্‌ট ও কারেণ্ট ঘটিত ব্যাপারটা বলিতে যাইতেছিল, বৈঠকখানার ভিতরের দরজার পাশে মা আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেজো কাকা তিনপুরুষে কেরানী, রিটায়ার করিয়া সম্প্রতি পেশেন্স খেলিতেছেন। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ছেলের মধ্যে ভাবী হাকিমের গন্ধ পাইয়া তিনি যুগপৎ পুলকিত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন।

মা প্রশ্ন করিলেন, কি রে রাণী?

মায়ের মন স্বতই স্নেহার্দ্র। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া মেয়ের বিপদে এভাবে সাহায্য করিবার জন্য সুবিমলকে তিনি আশীর্বাদ করিলেন, সুবিমল আগেই প্রণামটা সারিয়া লইয়াছিল।

কল্যাণীর দিদি আসিলেন, বি. এ. পাস, অত্যন্ত সুরসিকা। স্বামী রেঙ্গুনে অ্যাড্‌ভোকেট; খবর পাঠাইয়াছেন, এইবার আসিয়া পত্নীকে লইয়া যাইবেন। তিনি সুবিমলকে ইতিমধ্যেই কল্যাণীর ঘনিষ্ঠ ঠাওরাইয়া কয়েকটি রসাল রসিকতা করিতে প্রয়াস পাইলেন। কল্যাণী চটিয়া আড়াল হইতে ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিল।

তিনি কিন্তু সুবিমলকে ছাড়িলেন না, চা খাওয়াইয়া এবং চায়ের পেয়ালার মত তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে তুফান তুলিয়া দিয়া যখন কল্যাণীকে গানের ফরমাশ করিলেন, তখন মা ও মেজো কাকার পরামর্শ শুরু হইয়া গিয়াছে।

পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হইলেও সুবিমল বোকা ছিল না। হাসি ও ইঙ্গিত তীরের মত তাহার বুকে বিঁধিতে লাগিল। না হয় মূর্ছাপন্ন কল্যাণীকে সে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইতেই আসিয়াছে, কিন্তু সহৃদয়তা কি অপরাধ?

সেদিনের পর্ব শেষ হইল। খুশি হলাম বাবা, আবার কবে আসছ?—মায়ের সস্নেহ অনুরোধ; দেখবেন, ভুলে যাবেন না, আসবেন কিন্তু।—দিদির সকৌতুক আহ্বান; এবং স্বয়ং কল্যাণীর আনত দৃষ্টিক্ষেপ। সুবিমল পরদিনই মায়ের কাছে চলিয়া যাইবে স্থির করিয়া ফেলিল। কলিকাতায় আর নয়।

সুবিমলের ফার্স্ট হওয়ার কথাটা ঠিক, দেশে একটু দম লইয়া আসিয়া চাকুরির সন্ধান করিতে হইবে।

এ-পক্ষের এই কথা। কিন্তু সেদিনকার সেই হঠাতের আক্রমণে ও-পক্ষেও ভাঙাচোরা কম হয় নাই। দিদি বলিলেন, কোনও খবর নেওয়া নেই, মরবি যে! হয়তো—

কল্যাণী দিদির মুখ চাপিয়া ধরে, কলেজের খাতাগুলি গুছাইয়া লইতে লইতে লজ্জিতভাবে বলে, তুমি কি কানা দিদি?

কিন্তু সে ইউনিভার্সিটি আর নাই, সেই প্রফুল্ল ঘোষ, সেই জয়গোপাল ব্যানার্জি, সেই সুনীতি চ্যাটার্জি, সেই কমন-রূম! তেতলার ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে গোলদীঘির জল; বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুটাও যেন বদলাইয়া গিয়াছে—ওই চওড়া কপাল, রুক্ষতার অন্তরালে হৃদয় বলিয়া কি কিছু ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল, নহিলে লোকে তাঁহাকে দয়ার সাগর বলিত কেন? পড়িতে ভাল লাগে না, বি. এ. পাস করিতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল, এম. এ.টা পাস করা অসম্ভব। আর পাস করিয়াই বা হইবে কি! দিদি সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, রেঙ্গুন যাওয়াই ভাল।

খাইতে বসিলে মায়ের ঘ্যানঘ্যানানি যেন বাড়িয়া যায়—এটা খা, ওটা খা, মাছের মুড়োটা। মানুষে কি অত খাইতে পারে? দুধ না খাইয়া খাইয়া দুধ না-খাওয়াটাই অভ্যাস হইয়াছে, একটা কেমন গন্ধ!

মা বলেন, মেয়েটি ভাল বাবা, ফটোগিরাপ তো দেখলি! শুনেছি ইস্কুলে পড়েছেও। এক রকম কথা দিয়ে ফেলেছি।

সুবিমল কখনও মায়ের অবাধ্য নয়, পৃথিবীতে মা-ই তাহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা। মামারা তাহার পর। পাত্রী ছোট মামীর কোন আত্মীয়ের কন্যা। ছোট মামী বাপের বাড়ি গেলেন, মামাতো ভাইকে সঙ্গে করিয়া সুবিমল পাত্রী দেখিতে গেল। দরদালানে একটি শতরঞ্জি বিছাইয়া দিয়াছে, সামনে একটি আসন পাতা। ছোট মামীমা মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন। সুবিমল লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিতেছে না। ছোট্ট ছুইটি পা, দেখিতে মন্দ নয়, মেয়েরা আলতা কেন পরে এতদিন সে বুঝিতে পারিত না, আলতা জিনিসটা নেহাত নিরর্থক নয়।

মেয়েটি নমস্কার করিয়া সামনের আসনে বসিল, মামীমা তাহার পিঠে হাত দিয়া একটু ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া সস্নেহে বলিলেন, কি বাবা বিমল, কিছু জিজ্ঞেস কর, চোখ তুলে দেখ—কমলা আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে।

পাশের কোনও বাড়ি হইতে গ্রামোফোনের গান ভাসিয়া আসিতেছিল—

বুকে দোলে তার বিরহ-ব্যথার মালা—

কল্যাণীর সেই গান!

হঠাৎ—

পৃথিবীর রঙ বদলাইয়া গেল, ভূমিকম্প, ওলটপালট। লিফ্‌টের ভিতর কল্যাণীর মূর্ছাহত মুখ, বিদায়-মুহূর্তে তাহার লজ্জানত কাতর দৃষ্টি, দিদির 'আসবেন কিন্তু—'

অসম্ভব অসম্ভব! মাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সুবিমল মরিয়া হইয়া উঠিল। পৃথিবীতে তখন আর কোথাও কিছু নাই, সব লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে, শুধু সে আর দিদির হাত ধরিয়া কল্যাণী। চিরকালের ভদ্র, সংযত, নম্র সুবিমল এক নিমেষে নির্মম রূঢ় হইয়া গেল।

মেয়েটিকে সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, গান গাইতে পার তুমি? নাচতে জান?

ছোট মামীমার হাত কাঁপিল, মনে মনে বলিলেন, ধরণী, দ্বিধা হও।

আশেপাশে, ঘরের ভিতরে ও বাহিরের বারান্দায়, দরজা ও জানালা পথে কৌতূহলী ছেলেমেয়ের দল উঁকি দিতেছে, মামীমার বউদিদিরা আছেন, তাঁহার পিসীমাও কান পাতিয়া আছেন নিশ্চয়ই। সুবিমলের কত প্রশংসাই তিনি করিয়াছেন, এমন ছেলে এ যুগে হয় না,

চোখ তুলিয়া কথা বলিতে জানে না। ইহার পর তিনি আর এখানে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া?

গান গাইতে পার তুমি? নাচতে জান?

কিন্তু ব্যাপার কি? বেশি লেখা-পড়া করিয়া ছোঁড়াটা ক্ষেপিয়া গেল নাকি? কিংবা কলিকাতায় ডাইনীদের পাল্লায় পড়িয়া—? তুইটার একটাও সত্য হইলে তো জানিয়া শুনিয়া উহার হাতে কমলাকে দেওয়া চলিবে না। তিনি আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছেন। একেবারে পিসীমার কাছে গিয়া কাঁদিতে বসিলেন।
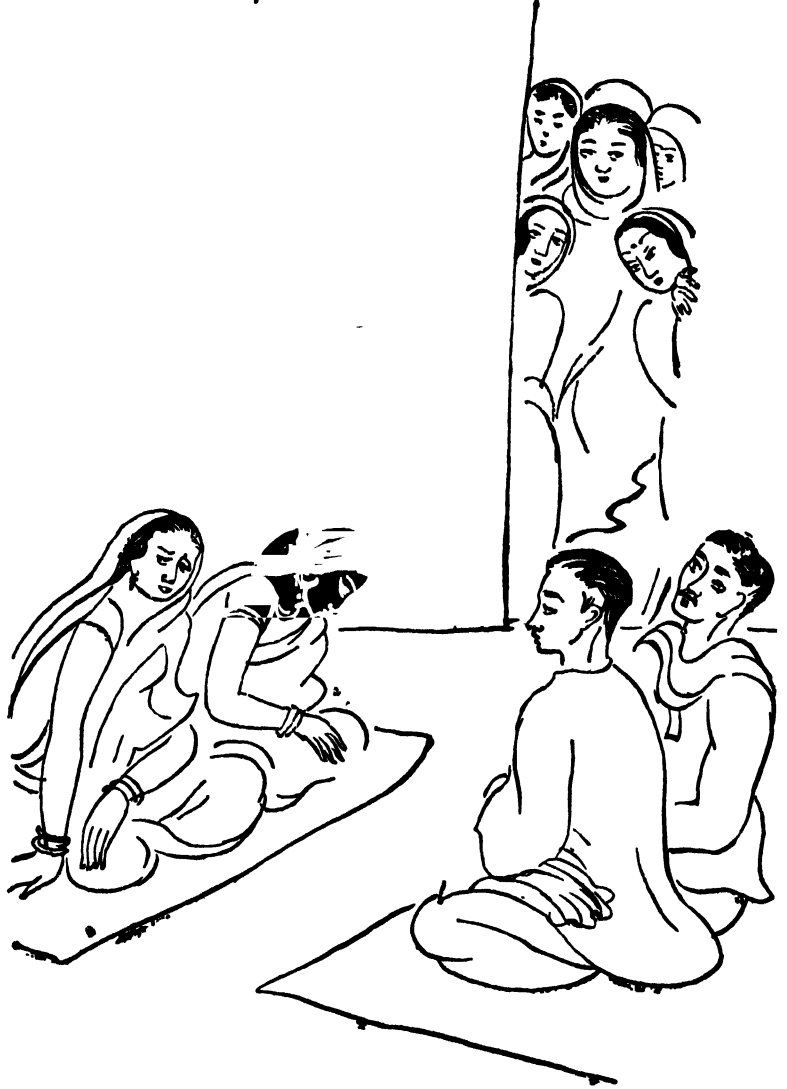
মামা তো ভাই শিশির সুবিমলের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। কমলা ভয়ে কাঁপিতেছে। আর কি বিশ্রী প্রশ্ন করা যায়, সুবিমল ভাবিতে লাগিল; যখন আরম্ভ করা গিয়াছে, শেষ করাই ভাল।

দীনবন্ধুর হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের লীলাবতী-সন্দর্শন পড়া ছিল, শেষ মার দিবার জন্য প্রশ্ন করিল, তুমি 'বিদ্যাসুন্দর' পড়েছ ?

প্রবীণাদের চাঞ্চল্যে ছেলেমেয়েরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, ভূমিকম্প হইলেও এমন হইত না। একজন আধাবয়সী মহিলা চিলের মত ছোঁ মারিয়া কমলাকে তুলিয়া লইয়া গেলেন। নিমেষমধ্যে অন্দর হইতে সদর পর্যন্ত খবর ছড়াইয়া পড়িল, সুবিমল প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আসে নাই।

মামাতো ভাই শিশির গোঁ-গোঁ করিতে করিতে এক রকম টানিতে টানিতেই সুবিমলকে বাহিরে লইয়া গেল ; দুই ঘা দিতে পারিলেই তাহার যেন তৃপ্তি হইত।

সুবিমল আর সেখানে দাঁড়াইল না, হাঁটিয়া স্টেশন এবং সেখান হইতে মায়ের কাছে পৌঁছিতে পাঁচ ঘণ্টা লাগিল। নিজের ঘরে ঢুকিয়া সুট্‌কেস গুছাইয়া লইতে মিনিট বিশেক মাত্র ; মা শশব্যস্তে আসিয়া নানা প্রশ্ন করিলেন। সুবিমল বেশি কথা না বলিয়া শুধু এক কাপ চা চাহিল। মা খাবার আনিলেন, খাইতে খাইতে সুবিমল বলিল, বিয়ে ভেঙে দিয়ে এলাম মা, আমাকে মাপ কর। আমি নটার ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছি, চাকরি করব।

বিস্মিত মাকে আর কিছু জানিবার বা বুঝিবার অবসর না দিয়া সুবিমল কলিকাতা চলিয়া গেল—একেবারে ল্যান্সডাউন রোড। মেজো কাকা পূর্ববৎ পেশেন্স খেলিতেছেন।

এই যে বাবা সুবিমল, এস এস। ওরে রাণী !

ডাক শুনিয়া দিদি আসিলেন, খোকাকে কোলে লইয়া পিছনে পিছনে কল্যাণী।

দিদি বলিলেন, আমি জানতাম—

কল্যাণী দিদির মুখে হাত চাপা দিতে গেল, দিদির ছেলে দেখাদেখি মাসীর মুখের উপর হাত রাখিল। কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া খোকাকে চুমু খাইতে যাইবে, দিদি তাহাকে টানিয়া ধরিয়া চুপিচুপি বলিলেন, থাম্ থাম্, ট্র্যান্সফার্ড এপিথেট হচ্ছে, দে, আমার ছেলে দে।

মা মর্মাহত হইয়াছেন, কিন্তু ছেলের উপর রাগ করিয়া থাকা অসম্ভব। হোক ছোট বউয়ের অপমান, ছেলে অনেক বড়।

ছেলে চিঠি লিখিয়াছে। কলিকাতার সরকারী কলেজে চাকরি হইতে পারে, ডেপুটি হইবার জন্য পরীক্ষাও দিবে। সমস্ত ঘটনা সে লিখিয়াছে, কল্যাণীরা ব্রাহ্ম নয়, হিন্দুই। মন্দের ভাল, ছেলের মত হইলেই হইল, বউ একজন চাই, কল্যাণী হইলেই বা দোষ কি ?

ছেলেকে ঘর ভাড়া করিতে বলিয়া শিশিরের সঙ্গে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। কল্যাণীর মেজো কাকা স্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন, ভদ্রলোককে ভালই লাগিল।

মা মেয়েদের লইয়া ভাবী বেয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কল্যাণী তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেই তাঁহার সমস্ত রাগ মুহূর্তমধ্যে জল হইয়া গেল। ভোলানাথ হইলে কি হয়—ছেলের পছন্দ আছে।

* * *

হঠাৎ—

বিবাহের পর বাসর-ঘরে বর-কনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। কল্যাণী ও দিদির বন্ধুভাগ্য ভাল, মেয়েরা গিজগিজ করিতেছে। দিদি চরকির মত ঘুরিতেছেন, কর্তা তো তবু রেঙ্গুন হইতে আসিয়া পৌঁছান নাই!

কল্যাণীর এক বন্ধু গান গাহিতেছে। সেই গান—

বুকে দোলে তার বিরহ-ব্যথার মালা—

হঠাৎ আলো নিবিয়া গেল। দিদি, না ফিউজ—শেষ পর্যন্ত বুঝা গেল না।

চার পয়সা

হরিদাস দোতলা বাস হইতে পাকা আমটির মত টুপ করিয়া নামিয়া পড়িয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে দ্রুত কাছে আসিয়া আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপা গলায় কহিল, শুনেছ ?

ইতিমধ্যে সমস্ত কর্নওয়ালিস স্ট্রীট সচকিত করিয়া অকস্মাৎ-মাকে-হারাইয়া-ফেলা শিশুর মত আর্তস্বরে বার তিনেক 'কেবলরাম, কেবলরাম' বলিয়া চেঁচাইয়া বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টার ও আরোহীগণকে সে ভীত চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার কান ও তাহার মুখ পরস্পর সান্নিধ্যে আসিতে এক মিনিট মাত্র সময় লইয়াছিল, দেখিলাম, এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আমার পাশে আট-দশ জন লোক জড় হইয়া গিয়াছে। বাসের কণ্ডাক্টার হাতল ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিহ্বলভাবে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। হরিদাস একবার আড়চোখে সেদিকে চাহিয়া সমবেত জনতাকে যেন লক্ষ্য না করিয়াই অবাক হইয়া গেল। একটু জোর গলায় বলিল, সত্যি বলছ, শোন নি ? অবাক কাণ্ড! এদ্দিন কলকাতায় ছিলে না নাকি ?

বলিলাম, না থাকলেই ভাল হ'ত, কিন্তু কলিকাতাতেই ছিলাম। এইমাত্র গৃহিণী এবং তাঁহার মাসতুতো ভাই অবিনাশের সম্মুখেই দুই মাসের বাকি টাকার জন্য গয়লার নিকট যে ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছি, প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম যে, সে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ না করিয়া বাসায় ফিরিব না ; পথে হরিদাসের এই কাণ্ড!

ঠনঠনে কালীতলার মোড়, দেখিতে দেখিতে লোক বাড়িতে লাগিল, বাসটিও চলিয়া গিয়াছে। হরিদাসকে বলিলাম, চল, হাঁটতে হাঁটতে শুনছি।

কিন্তু হরিদাসের এই আকস্মিক সঙ্গ আমার ভাল লাগিল না। বাসা হইতে ঠনঠনের কালীতলার মোড় পর্যন্ত আসিতে আসিতেই একটা মতলব ঠাওরাইয়া ফেলিয়াছিলাম। দুই হাজার টাকার একটা ইন্‌সিওরেন্স-পলিসি ছিল, চার বছর ধরিয়া প্রিমিয়াম চালাইয়াছি, লোন যতটা লওয়া যায় লইয়াছি ; ভাবিতেছিলাম, গাড়িচাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়া গয়লার টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করিব—শেষ পর্যন্ত অন্য উপায় না হউক, এই রাস্তা কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না। বুকে অনেকটা ভরসাও হইয়াছিল— হরিদাস ব্যাঘাত না ঘটাইলে মা কালীকে একটা প্রণাম করিয়াই আসিতাম। গৃহিণীর একটু কষ্ট হইবে—তা হোক। না খাইতে পাইয়া সকলে মরার চাইতে বিধবা করিয়া স্ত্রীকে

দুই মুঠা খাইতে দেওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই একটা গৌরব আছে। একজন নিঃসন্তান বিধবার ১৭৮২৲ (দেনা দুই শত ও গয়লার আঠারো টাকা বাদ) টাকা আজীবন ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছিল।

দুইজনে চলিতে শুরু করিলাম দেখিয়া কুতূহলী জনতা ক্ষুণ্ণ হইয়া এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়িল। হরিদাস একবার তাহাদের দিকে চাহিয়া পরম স্নেহে আমার কাঁধের

দোতলা বাস হইতে নামিয়া পড়িয়া কাছে আসিয়া আমার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চাপা গলায় কহিল

উপর হাত রাখিয়া বলিল, শোন নি ? সকাল থেকে এক কাপ চাও জোটে নি—খাওয়াবে এক কাপ চা ?

আমার এক কাপ চা শুধু কেন, এক পাত্র হালুয়াও জুটিয়াছিল ; সুতরাং হরিদাসের সম্বন্ধে অনুকম্পা হইল। বলিলাম, এই এক কাপ চায়ের জন্য এত কাণ্ড ? বাস ছেড়ে নামতে হ'ল ?

হরিদাস হাসিল, বলিল, নামতে হ'তই, না নামলে নামিয়ে দিত। রাস্তায় লোক খুঁজছিলাম, কণ্ডাক্টার আর একটু কাছে এসে পড়লেই অচেনা লোককেই চেনা নাম ধ'রে

ডেকে নেমে পড়তে হ'ত ; তবু যা হোক, তোমাকে পেলাম, মানটাও বাঁচল, চা-ও হবে। হবে না ভাই ?

আমি হাসিলাম, বলিলাম, হবে বইকি, শুধু চা কেন, ছুটো ক'রে হাফ বয়েল, টোস্ট। মরিতেই যখন বসিয়াছি তখন আর মায়া কেন ? হরিদাসের সাধ মিটাইয়া তবে মরিব।

হরিদাস যেন শিহরিয়া উঠিল, বলিল, যে মাগ্যিগণ্ডার বাজার ভাই, শুধু চা-ই জোটে না—ওসব নয়, ওসব নয়।

আমার মেজাজ তখন চড়িয়া গিয়াছে। বলিলাম, একদিন তো! তোমার সঙ্গে তো আর রোজ দেখা হচ্ছে না। একটা দিন না হয়—

হ্যারিসন রোডের দিকে চলিতেছিলাম, হরিদাস হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া শ্যামবাজার-মুখো হইল। আমার হাত ধরিয়া হঠাৎ টানিয়া বলিল, খরচই যখন করবে, চল, বাড়ি যাই। পয়সাটা গিন্নীকে ফেলে দিলে চা-ও হবে, ছু-চারখানা ক'রে নিমকি—

আমার মনটা ছোট হইয়া গেল। হিমালয়ের শীর্ষদেশ হইতে যেন তেরাইয়ের জঙ্গলে পড়িলাম। তবু আজ সব কিছু সহিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম বলিয়া হরিদাসকে বাধা দিলাম না। বলিলাম, চল।

নীট্‌শে বা শোপেন্‌হাউয়েরের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, তবু মনে হইল, আজ এই মুহূর্তে জীবন সম্বন্ধে আমার মনে যে নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই, হয়তো গয়লার টাকা দিতে না পারার ছুঃখ তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় নাই। হরিদাসের প্রতি যেমন, তাঁহাদের প্রতিও তেমনই অনুকম্পা হইল।

হেছুয়ার মোড়ে একটা দ্রুতগামী মোটরের তলায় পড়িয়া একটা পথের কুকুর রক্তাক্ত পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল। হাসিয়া হরিদাসকে বলিলাম, কুকুর না হয়ে একটা মানুষ হ'লে ভাল হ'ত।—বলিয়া আবার হাসিলাম। হরিদাস কথা কহিল না, আমার দিকে একটা বিস্ময় ও ঘৃণা মিশ্রিত দৃষ্টি হানিয়া ছুটিয়া গিয়া কুকুরটাকে কোলে তুলিয়া ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়ার জল খাইবার একটা জলাধারের নিকট লইয়া গিয়া জল দিয়া পা ধোয়াইতে শুরু করিল। হরিদাসের প্রতি এবার আমার অত্যন্ত করুণা হইল, মনে মনে বলিলাম, ফুল। হাঁকিয়া বলিলাম, কি হে, অ্যাম্বুলেন্স ডাকব ?

হরিদাস কুকুরটিকে একটি গাছের ছায়ায় সন্তর্পণে নামাইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল, পয়সা থাকলে একটা রিক্‌শয় চাপিয়ে ওটাকে বাড়ি নিয়ে যেতাম, পট্টি লাগিয়ে দিলেই সেরে উঠবে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে, হাসছ কেন ?

বলিলাম, পয়সা আছে, ডাক রিক্‌শ। এই!

হরিদাস অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, কথা বলিল না।

কুকুরসমেত হরিদাসের বাসায় যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা হইয়াছে। হরিদাসের বাসায় ইতিপূর্বে কখনও আসি নাই; দেখিলাম, ছেলেতে মেয়েতে কুকুরে পাখিতে খরগোশে এঁদো গলির চুনবালি-উঠা একতলা বাড়িখানা গমগম করিতেছে। বাহিরের ঘরেই নাহক বাইশজন; ভিতরে অন্তত তিনজন যে আছে, আভাস পাওয়া গেল।

দুইখানি মাত্র ঘর, হরিদাসের পৈতৃক, হয়তো বন্ধক পড়িয়াছে, তবু ছিল বলিয়া এখনও অন্তত নীলাকাশ হরিদাসের মাথার উপর চাঁদোয়া খাটায় নাই। হরিদাস কুকুরটাকে লইয়া ভিতরে যাইতে যাইতে বলিল, নন্‌কুকে কিছু পয়সা দাও ভাই, ও ততক্ষণ ময়দা, একটু ঘি আর চিনি নিয়ে আসুক, বাকি জিনিস বোধ হয় বাড়িতেই আছে।

বাকি জিনিস—অর্থাৎ চা এবং চুলা! এবার হরিদাসের উপর শ্রদ্ধা হইতে লাগিল। নন্‌কু পয়সা পাইয়া লাফাইতে লাফাইতে অন্তর্ধান করিল। একটা ক্যাংলাগোছের মেয়ে বৈঠকখানা-ঘরের এক কোণে কয়েকটা ইষ্টকখণ্ড লইয়া ঘর সাজাইতে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই, তোর নাম কি?

মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল, কথা বলিল না। জিজ্ঞাসা করিলাম, হরিদাস তোর কে হয় রে?

জবাব নাই, তবু অপলক দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। কেমন অস্বস্তি বোধ হইল, ভাবিলাম, কালা বোবা নাকি? বেশিক্ষণ গবেষণা করিতে হইল না, আট-দশ বছরের একটি ছেলে হাসিতে হাসিতে আমার কাছে আসিয়া বলিল, ও হাবী, কথা বলতে পারে না যে।

বলিলাম, বটে, কিন্তু ও তোমার কে হয়?

ছেলেটি বলিল, কেউ নয়, বাবা ওকে দেওঘর থেকে কুড়িয়ে এনেছে। ওর কেউ নেই কিনা।

মাথার ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। আর কাহাকেও কিছু প্রশ্ন করিতে ভরসা হইল না। হরিদাস ততক্ষণে খালি গায়ে থেলো হুঁকার কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া উপস্থিত। বলিল, গিন্নীর জিম্মা ক'রে দিয়ে এলাম ভাই, সারবে ব'লেই মনে হচ্ছে।

প্রথম দর্শনেই মনে হইল, উঠিয়া হরিদাসের পায়ে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করি, কিন্তু এই ভাব মুহূর্তমধ্যেই কাটিয়া গিয়া দারুণ বিরক্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। মনে হইল,

হরিদাসের গালে কষিয়া এক চড় বসাই, তারপর রাস্তা তো আছেই। তবু মানুষের দুর্বলতা, জিজ্ঞাসা করিলাম, হাবীর মত কতগুলি আছে ?

হরিদাস হাসিল, বলিল, এর মধ্যেই খবর পেয়েছ ; মটরু-গেজেট খবর দিয়েছে বুঝি ? নতুন কেউ এলেই তাকে প্রথমেই সব খবর দেওয়া চাই। তা ভাই, বেশি আর পারি কই ? তিনটি মানুষ আর পাঁচটি পশু।

বলিলাম, পশু ছটি, তোমাকে নিয়ে। কিন্তু দেখ, আর নয়, এখানে আমার দেবতার অপমান হচ্ছে, আমি চললাম।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, কোথা দিয়া কি ঘটিল বুঝিতে না পারিয়া হরিদাস থতমত খাইয়া গেল। বলিল, নন্‌কু এল ব'লে ভাই, দেরি হবে না। চাটা না খেয়ে গেলে গিন্নী মনে ভাববেন, আমারই দোষ—

বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে কাঁদিয়া ফেলিব ভাবিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। ঈশপের গল্প মনে পড়িল। অপদস্থ পীড়িত লাঞ্ছিত খরগোশেরা একবার দল বাঁধিয়া পুকুরে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া ব্যাঙেরা ভয় পাইয়াছে জানিয়া জীবনে তাহাদের শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমার আবার বাঁচিতে সাধ হইতেছিল। গয়লার টাকা কষ্টে-সৃষ্টে শোধ দিলেই হইবে, না হয় একটু অপমানিত হইব। গিন্নীকে দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইল। থপ করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া হাবীকে কোলে তুলিয়া লইলাম। হাঁকিলাম, আন তোমার নিমকি, আজ খেয়েই ফতুর হব।

হরিদাসের মুখে আর হাসি ধরে না। নিমকির প্লেট সামনে আগাইয়া দিয়া বলিল, খেয়ে দেখ, গিন্নী একেবারে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী।

চোপ!—বলিয়া হরিদাসের গালে এক চড় মারিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের উত্তাপ জল হইয়া গিয়া চোখের কোণ আশ্রয় করিল। পকেট হইতে চারটি পয়সা বাহির করিয়া বলিলাম, এই নাও ভাই, আর কণ্ডাক্টারকে ফাঁকি দিও না।

খোঁড়া কুকুরটা ততক্ষণে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিমকির লোভে পাশে আসিয়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াছে।

কৌপীন

গল্প শুনিয়াছি, এক বিষয়বাসনামুক্ত পুরুষ নানা কারণে সংসারধর্মে অসন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক ইষ্টসাধনার নিমিত্ত লোকালয় হইতে দূরে এক গভীর অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। লজ্জা নিবারণের জন্য কৌপীন এবং অন্য প্রয়োজনে লোটা ও কম্বল মাত্র তাঁহার সম্বল ছিল। অরণ্যে নিরুপদ্রবে জপে তপে তাঁহার দিন যায়; রৌদ্র-বৃষ্টি গা-সহা হইয়াছে, বাঘ-ভালুকেরও উৎপাত নাই, কিন্তু ইঁদুরে বড় জ্বালাতন করে। কৌপীন ও কম্বল কাটিয়া কুটিকুটি করে, নিদ্রার ঘোর অধিক হইলে জুলপির চুল পর্যন্ত কাটিয়া লইয়া যায়। চুলে জট ধরিবার পূর্বেই সন্ন্যাসী উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন এবং নিরুপায় হইয়া শেষে নিকটস্থ জনপদ হইতে একটি মার্জার সংগ্রহপূর্বক শিয়রে তাহাকে আশ্রয় দিয়া ইঁদুর তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরেরা দূরে থাকিতে লাগিল বটে; কিন্তু দুগ্ধের অভাবে বিড়ালটি গভীর রাত্রে বড় কাঁদিতে লাগিল। সুতরাং বিড়ালের দুধের ব্যবস্থার জন্য একটি গাভী সংগ্রহ করিতে হইল। এবং এই ভাবে ক্রমে ক্রমে অচিরকালমধ্যে সংসারবিবাগী সন্ন্যাসীকে সেই মনুষ্যবাসহীন অরণ্যেই মায় সহধর্মিণী পর্যন্ত রীতিমত একটা সংসার পাতিতে হইল। সম্ভবত মৃত্যুকালে উইল করিবার জন্য বাড়ির কাছাকাছি একজন উকিলকেও তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং উইল প্রোবেট লইবার জন্য উকিল যে শেষ পর্যন্ত একটা আদালত এবং তৎসংলগ্ন বটতলা না বসাইয়া ছাড়িয়াছিল, এরূপ মনে হয় না। কিন্তু পুরাতন গল্পে তাহার উল্লেখ নাই।

বটতলার আড্ডাতেই আমাদের কথা হইতেছিল। বটগাছ ছিল না বটে, কিন্তু বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া ছিল এবং গরম চা ও সিগারেট-চুরুটের ধোঁয়া বাগবাজারের ধোঁয়াকেও হার মানাইতেছিল। তপন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং উত্তেজনার আতিশয্য হইলেই তাহার কথা জড়াইয়া যায়। আমার অপরাধ হইয়াছিল, আমি আর্থিক দৈন্য সত্ত্বেও স্ত্রীর প্ররোচনায় একটি ডবলস্প্রিংযুক্ত সহজবহ গ্রামোফোন মাসিক দশ টাকা বন্দোবস্তে খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম, উপরের ঘরে গৃহিণী বঙ্কিম ঘোষের একটি সদ্যক্রীত ক্ল্যারিওনেট গৎ সেই গ্রামোফোনেই বারম্বার বাজাইয়া সম্ভবত সেটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তপন বলিল, নাও, এবারে ঠ-ঠ-ঠ্যালা সামলাও? শুধু কি এই কান-ঝালাপালা! এর পর ম-ম-মাসে মাসে রেকর্ডের বিল! আর কি হাঁফ ছাড়বার ফু-ফু-ফুরসৎ পাবে?

পরাশরের নাম হওয়া উচিত ছিল নারদ, ফোড়ন দিয়া ঝগড়া বা কথা বাড়াইতে তাহার জুড়ি নাই, বলিল, এখনই হয়েছে কি! দিনরাত্তির গান শুনতে শুনতে কানের যখন মৌতাত জ'মে আসবে, দম দিতে দিতে হাত তখন যাবে এলে। দেখছ কি তপন, রেডিও একটা এল ব'লে। লেখা-টেখা এখন—

সন্ন্যাসীকে সেই মনুষ্যবাসহীন অরণ্যেই মায় সহধর্মিণী পর্যন্ত রীতিমত একটা সংসার পাতিতে হইল

তপন আরও ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল, ক-ক-কচু খেলে যা, আমি কোথায় ডাক্তারি ফেলে তিন শো মাইল ভেঙে একটু মনের খোরাক নিতে আসি, না কানের কাছে গ্রামোফোন বাজিয়ে সব দিলে মাটি ক'রে। গ্রামোফোন তো ছাই ছাপরাতেও আছে, এ-পাশে একটা, ও-পাশে একটা, জ্বালাতন হয়ে গেছি। সাধ ক'রে উচ্ছন্নে যাবে, তা—

এমন সময়ে হরিদাস আসিয়া আমার লাঞ্ছনা অজ্ঞাতসারে বাড়াইয়া দিল। ঘরে

ঢুকিতে ঢুকিতেই বলিল, ছি ছি ছি, এই 'টকি'তেই দেশটাকে রসাতলে দেবে, দেখে নিও তোমরা।

মন্মথ কোণ হইতে ঘাড় উঁচু করিয়া বলিল, ব্যাপার কি হে? এত চটলে কেন?

হরিদাস পাখাটা একটু বাড়াইয়া দিয়া গলারও পর্দা চড়াইয়া বলিল, চটব না? থানার পাশ দিয়ে আসছিলাম, শঙ্করদা ডাক দিলেন। ঘরে ঢুকেই দেখি, অবাক কাণ্ড! তিন-তিনটে চোদ্দ-পনরো বছরের ছোকরা, এখনও স্কুলে পড়ছে সব, পা ফাঁক ক'রে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে মা-কালীর মত জিব বের ক'রে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে, আর তাদের গাল বেয়ে চোখের জল গড়াচ্ছে। শঙ্করদা হেসে বললেন, দেখুন আপনাদের চণ্ডীদাস টকির কীর্তি দেখুন। আপনারা যত তার ঢাক পেটাচ্ছেন, এই ছোঁড়াগুলো তত উঠছে ক্ষেপে। সৎ পথে পয়সা যোগাড় করতে না পেরে অসৎ পথ ধরছে। চণ্ডীদাস না দেখলে জীবনই বিফল! এই ইনি অমুক পোস্টমাস্টারের গুণধর জ্যেষ্ঠ পুত্র, খিদিরপুরে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে এই ঘড়িটা এনেছেন চুরি ক'রে, বেচতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। ইনি অমুক ইন্‌স্টিটিউশনের হেডমাস্টার মশাইয়ের নাতি, কিছু সুবিধে করতে না পেরে বাড়ির ঝিয়ের গলার হার চুরি ক'রে সিনেমাপ্রীতি দেখাতে যাচ্ছিলেন, পাড়ার পাঁচজনের নিষ্ঠুরতায় এখানে হাজির হয়েছেন। চণ্ডীদাস শুরু হয়েছে আজ পাঁচ দিন—রোজ আটটা দশটা এই ধরনের কেস আসছে। সব বেটা সিনেমার দোহাই পাড়ে, আমরা তো মারা গেলাম মশাই। তবেই বোঝ, ঘরে ঘরেই সিঁদেল চোর, গাঁটকাটা, আর পিক্‌পকেট তৈরি শুরু হয়েছে। টকি যত বাড়বে, চোর-ছ্যাঁচড়ে তত দেশ ভ'রে যাবে। কি হবে এ জাতের?

সুরেন কম কথা বলে, একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া বলিল, শুধু সিনেমা কেন, রেডিও, গ্রামোফোন—

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই গ্রামোফোন-প্রসঙ্গ। তপন তোতলামি করিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল। আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ঘাট হয়েছে আমার, অপরাধ ক'রে ফেলেছি। গ্রামোফোনের গান লিখেই দেনাটা শোধ করব। কিনে যখন ফেলেছি—

পরাশর একটু খোঁচা দিয়া বলিল, রাস্তাটা ভাল; থিয়েটারে নেমে দেখার শখ মেটাতে হবে, রেডিওয় বক্তৃতা দিয়ে রেডিওর বিল শোধ করবে, গ্রামোফোনের গান লিখে—

যোগেশ তপনের ভগ্নীপতি। পাটের ব্যবসা করিয়া যথেষ্ট সহজবুদ্ধি অর্জন করিয়াছে। সেই শুধু আমার পক্ষে হইল। পরাশরকে বাধা দিয়া বলিল, আপনারা সাহিত্যিকরা,

মশাই, নিতান্ত স্বার্থপরের দল; নিজেরা সাহিত্যের নাম ক'রে ব'সে ব'সে কেবল রাজা-উজির মারবেন, বাড়ির মেয়েরা তো রাত বারোটা না বাজলে আপনাদের টিকিই দেখতে পান না! তাঁরা করেন কি? বেশ করেছেন মশাই। আর আমি ব'লে রাখছি, সব শালাকেই এর একটা না একটা নিয়ে থাকতে হবে—হয় সিনেমা, নয় গ্রামোফোন, নয় রেডিও। দেখবেন আপনারা। তপনবাবুই কি পার পাবেন নাকি? একা তো সংসার করেন না!

তপন ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া প্রতিবাদ করিতে গেল, কিন্তু তাহার কথা যোগাইল না। একটু দম লইয়া বলিল, ম-ম-ম'রে যাব না তার চাইতে! বরঞ্চ ডাক্তারি ছাড়তে রাজী আছি, কিন্তু আমার সাহিত্য-বুদ্ধি—

যোগেশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, থাক্ থাক্, চট ক'রে মরছি না আমিও। বেঁচে থাকলে দেখতে পাবই।

মোটের উপর, সেদিন ডাক্তার তপন মুখোপাধ্যায় ওরফে বিখ্যাত কবি ও গল্পলেখক "মীনকেতনে"র কলিকাতা-প্রবাস তেমন জমিল না। আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় তাহাকে বিদায় দিলাম। যোগেশ শুধু ভরসা দিয়া আমাকে বলিয়া গেল, কুছ পরোয়া নেই।

আরও এক বৎসর অতিক্রান্ত হইল। তপন আর কলিকাতা আসিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার উপর চটিয়াই সে কলিকাতা আসা ছাড়িয়াছে। আর্ট এবং সাহিত্য-বুদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করিয়া একটা বর্বর গ্রামোফোন-খরিদের লজ্জা তখনও আমার দূর হয় নাই; এইজন্য চিঠিপত্রে এই প্রসঙ্গটাকে বাদ দিয়াই চলিতাম। তাহা ছাড়া এক বৎসরের মধ্যে পরাশরের কথাই ফলিয়াছিল। আমার ডবলস্প্রিংযুক্ত সহজবহ গ্রামোফোনটি ছিটের কাপড়ের ঘেরাটোপ পরিয়া নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে শোয়ার ঘরের কোণের টেবিলটি আশ্রয় করিয়া পড়িয়া ছিল। রেকর্ড খরিদের ঝঞ্ঝাট আর পোয়াইতে হয় না। এবারেও স্ত্রীর প্ররোচনায় মাসিক বন্দোবস্ত-প্রণালীতে একটি রেডিও সেট খরিদ করিয়া বিনাদমে সকাল-সন্ধ্যা গান শুনিবার অপূর্ব সুযোগ করিয়া লইয়াছিলাম; এবং আপনাদিগকে গোপনে বলিয়া রাখি, দেনা পরিশোধের জন্য মাঝে মাঝে রেডিও-অফিসে গিয়া এক-আধটা প্রবন্ধ-গল্প পড়িয়াও আসিতেছিলাম।

.. হঠাৎ টেলিগ্রামের মত সংক্ষিপ্ত তপনের এক চিঠি পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সে লিখিয়াছে, "অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তুমি গ্রামোফোনে যে সকল গান দিয়াছ, তাহার কপি লইয়া অবিলম্বে আসিয়া আমার দুর্দশা দেখিয়া যাও। এখনও ডাক্তারি করিলেও একজন প্রতিশোধপরায়ণ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি অভিশাপ দাও নাই তো? ইতি—তপন"

চিঠিটি বার বার পড়িয়াও অর্থবোধ হইল না। সুতরাং আমাকে ছাপরা ছুটিতে হইল। ভোর পাঁচটায় ছাপরায় ট্রেন পৌঁছে। স্টেশন হইতে এক ছ্যাকরা-গাড়ি করিয়া তপনের বাসার কাছাকাছি যখন পৌঁছিলাম, তখন শীতের জড়তা ভেদ করিয়া ভোরের আলো ফুটিতেছে। গাড়ি হইতে নামিয়াই কিন্তু অবাক হইতে হইল। তপন বাসা বদলাইল নাকি? বাড়ির ভিতর হইতে রুদ্ধ বাতায়ন ভেদ করিয়া ভৈরবীতে সানাইয়ের আওয়াজ আসিতেছে—তপনের বাড়িতে গ্রামোফোন কিছুতেই বাজিবে না। বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি। তথাপি কপাল ঠুকিয়া দরজায় ঘা দিলাম। দরজা খুলিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু আমি মূর্ছিত হইতে হইতে বাঁচিয়া গেলাম। তপন পুত্রকন্যাপরিবেষ্টিত হইয়া ঈজি-চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া আছে, এবং তাহার গৃহিণী টেবিলে রক্ষিত একটি পোর্টেব্‌ল গ্রামোফোনে কষিয়া দম দিতেছেন। সানাই বাজিতেছে। যাক, বাঁচা গেল।

তুমি তবু এলে।—বলিয়া তপন উঠিয়া ঢিপ করিয়া আমার পায়ের কাছে একটা প্রণাম করিল।

আরে আরে, কর কি?—বলিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিলাম।

সে বলিল, প্রত্যক্ষ ভগবান, দেখতে পাচ্ছ ওই টেবিলের ওপর—সানাই নয়, ভগবানের প্রত্যাদেশ। দাও ভাই, আমার কানটা ম'লে দাও।

ভগবানের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তিনি ডালা-খোলা অবস্থায় টেবিলের উপর ফ্ল্যাট হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সম্ভবত তাঁহার মাথাটাই বনবন করিয়া ঘুরিতেছে, মিসেস তপন ঘুরাইতেছেন, এবং আশেপাশে টেবিলের উপর, তাকের উপর, মেঝের উপর তেত্রিশ কোটি দেবতারা রেকর্ড-মূর্তি ধারণ করিয়া বাক্সবন্দী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। দৃশ্য অপূর্ব এবং তপনের বাড়িতে অভাবনীয়।

রোগীর সাংঘাতিক কোনও উপসর্গ দেখিলে ঝানু ডাক্তার যে ভাবে প্রশ্ন করে, কি ক'রে হ'ল—আমিও ঠিক সেই ভঙ্গিতে তপন-ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ক'রে হ'ল?

তপন সংক্ষেপে আনুপূর্বিক সমস্ত বিবৃত করিল। তপন-গৃহিণী সেই অবসরে চা প্রস্তুত করিতে গেল।

তপন যাহা বলিল, তাহা এই—

গত বৎসর মার্চ মাসের শেষাশেষি যোগেশ শ্যালকসঙ্গমের আশায় ছাপরা যায়—সঙ্গে একটি পোর্টেব্‌ল গ্রামোফান; খানকয়েক রেকর্ডও একটা বাক্সের মধ্যে ছিল; তপন গ্রামোফোনের ঘোর বিরোধী—এ কথা যোগেশ জানিত বলিয়াই বোধ হয় ছাপরায় অবস্থানকালে চাবি হারাইয়া গিয়াছে এই অজুহাত দেখাইয়া অকারণ বিরক্তি হইতে তপনকে নিষ্কৃতি দিয়াছিল। তপনের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা চাবিওয়ালা ডাকাইয়া দুই-এক বার দুই-একটা গান শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও যোগেশ তাহাদের ঠেকাইয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে, সমস্তই তাহার কারসাজি। সে ঠিক ১লা এপ্রিল তারিখে ছাপরা ত্যাগ করে এবং যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে গ্রামোফোনটি লইতে ভুলিয়া যায়। কে যেন সেটিকে খাটের তলায় ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। রেকর্ডের বাক্সটি সে কিন্তু সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। যোগেশ চলিয়া যাওয়ার এক দিন পরে যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়; এবং তপনের স্ত্রী সেটিকে নাড়িতে-চাড়িতে গিয়া দেখিতে পান, চাবি হারানোর অজুহাত মিথ্যা, ডালা খোলা ছিল। তপন সেই দিনই যোগেশকে চিঠি লিখিয়া দেয়। প্রত্যুত্তরে যোগেশ জানায়, গ্রামোফোনটি এখন ছাপরাতেই থাক্। পরে কোনও সময়ে সে গিয়া লইয়া আসিবে।

আসলে যোগেশ যে তপনকে "এপ্রিল ফুল" বানাইয়া আসিয়াছে, এতদিনে তাহা সে উপলব্ধি করিতেছে। যন্ত্র কোনও কথাই বলে না, চুপচাপ পড়িয়া থাকে; কিন্তু কোন বাড়িতে তাহার উপস্থিতিই মারাত্মক। এই জাতীয় যন্ত্র সম্বন্ধে পুরাকালে শাস্ত্রকারদের কোনও জ্ঞান থাকিলে ঘৃত এবং অগ্নির উপমাটা এ ক্ষেত্রেও তাঁহারা প্রয়োগ করিতেন। ডাক্তারকে লইয়া ঘর করিলেও তপন-গৃহিণী স্ত্রীজাতীয়। নানাবিধ সুবিধা সত্ত্বেও একটি যন্ত্র বিকল হইয়া পড়িয়া আছে, এটা তাঁহার সহিল না। সামনে পটলবাবুর বাড়ি, রেকর্ড চাহিয়া আনাইলেই হয়। ওদিকে ইন্দু ঠাকুরপোরাও আছেন। খরচের মধ্যে শুধু পিন, এক বাক্সের দাম মাত্র চার আনা। তাহা ছাড়া ছাপরায় দুইটি গ্রামোফোনের দোকানের স্বত্বাধিকারীও অত্যন্ত আপনার লোক। রেকর্ড চাহিয়া আনিয়া খুশিমত বাজাইয়া ফেরত দিলেও ক্ষতি নাই।

সুতরাং—

তিনি বাজিতেছেন, এবং রেকর্ডে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া চুলায় গিয়াছে। তাহারা এখন সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, ক্যাটালগ হাতে বসিয়া আছে এবং যন্ত্রের সঙ্গে গলা মিলাইয়া ওস্তাদ হইবার প্রতীক্ষা করিতেছে। মহাত্মা গান্ধী গেল, রবীন্দ্রনাথ গেল—এখন অমুক মল্লিক এবং অমুকা বসুর গলা নকল করিতে করিতেই দিন যাইতেছে। তপনেরও দুর্দশা বড় কম হয় নাই। ভোরে ভৈরবীতে সানাই না বাজিলে এখন আর তাহার ভাল করিয়া ঘুম ভাঙে না, দুপুরে খাইতে বসিয়া পিয়ানোতে গজলের গৎ না শুনিলে ভুক্তদ্রব্য সহজে হজম হয় না, এবং গভীর রাত্রে সুরবাহারের তিন-মিনিট-স্থায়ী আলাপ না শুনিলে চোখের পাতা পড়িতে চায় না। দোকান ও পাশের বাড়ি হইতে চাহিয়া-চিন্তিয়া আনিয়া আমিরি করা তবু সহ্য হইতেছিল, এখন মূলে টান পড়িয়াছে। শুধু পিনে শেষ পর্যন্ত শানায় নাই।

"শশধর মিউজিক মার্ট" হইতে তৃতীয় দফায় যে বত্রিশখানি একদম আনকোরা রেকর্ড আনা হইয়াছিল, একদিন প্রাতঃকালে তপনের কন্যা কেয়া তাহারই একগোছা অসাবধানে ধরিয়া একটি প্রিয় রেকর্ড বাজিতেছিল। হঠাৎ তপন তাহাকে লেখাপড়া সম্বন্ধে ধমক দিতেই রেকর্ডের গোছাটা হাত হইতে পড়িয়া গিয়া কেলেঙ্কারি শুরু হইল। চারখানি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। আটখানির কানা ভাঙিল এবং খানকয়েক এখানে ওখানে শুধু ফাটিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিল। ভাঙা রেকর্ডগুলিই হইল সন্ন্যাসী তপন মুখুজ্জের কৌপীন—অবশ্য খালি পিনের বাক্সগুলি গণনার মধ্যে ধরা হইতেছে না।

যাঁহাদের বাড়ি হইতে বারম্বার রেকর্ড চাহিয়া আনিয়া বাজানো হইতেছিল, তাঁহারাও দুই-চারিখানি নূতন অর্কেস্ট্রা, গৎ বা গানের সন্ধানে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। অত্যন্ত আপনার লোক হওয়া সত্ত্বেও দোকানদাররা দোকানদার, তাহাদের কাছে খুব বেশিদিন চক্ষুলজ্জা না আসিয়া পারে না। গৃহিণীরও দুই-একটি পালাগান বিশেষভাবে হাতের কাছে রাখিবার ইচ্ছা। ছেলে-মেয়েরা বুড়োদের গান বা গতে সন্তুষ্ট নয়—দুই-চারিখানা 'শিশু-ভারতী'-মার্কা রেকর্ড, এবং স্বয়ং তপনের কবি-মনের শখ—কলিকাতা হইতে কিনিয়া না আনাইলে ছাপরায় বসিয়া সে শখ মেটানো দুষ্কর। সুতরাং ইঁদুর তাড়াইতে বিড়ালের আবির্ভাব হইতে লাগিল।

এদিকে ডাক্তারি ব্যবসায়ের অবস্থা সঙিন। ডাক্তারবাবু কাফিসিন্ধুতে মশগুল হইয়া সটকা মুখে আরাম-কেদারায় পড়িয়া পড়িয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছেন। চাকর সিতাবী বারকয়েক ডাকিয়া ডাকিয়া জবাব না পাইয়া রোগী ফিরাইতেছে। কতকগুলা

রেকর্ড সন্ধ্যার মধ্যেই ফেরত না দিলে নয়—মরণোন্মুখ রোগীর কথা ভুলিয়া ডাক্তার গানের সঙ্গে সঙ্গে শিষ এবং তুড়ি দিতেছেন।

তপনের ভাই ভোলা কলিকাতায় যাইতেছে, যোগেশ তাহার হাতেই পরিত্যক্ত গ্রামোফোনটি ফেরত পাঠাইতে বলিয়াছে। তপনের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। প্রথমটা ভাবিল, যোগেশকে শাস্তি দিবে, গ্রামোফোন সে ফেরত পাঠাইবে না। কিন্তু কুটুম্বিতার কথা স্মরণ করিয়া তাহার বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। বাক্স কয়েক রেকর্ড ইহার মধ্যেই জমিয়াছে। এখন উপায়?

* * *

উপরের বিবৃতি দিয়া তপন হাঁপাইতে লাগিল। বহুকষ্টে বলিল, উপায় এখন তুমি। গ্রামোফোনটা বিদায় করার আগে যেমন ক'রেই হোক আর একটা ঘরে আনতে হবে। যে রকম হ্যাবিট হয়ে দাঁড়িয়েছে, নইলে পাগল হয়ে যাব। ভোলা যাবে সন্ধ্যেয়। দুপুরে গিয়ে দেখে শুনে একটা মেশিন এনে ফেলতে হবে। ধারে তো আনি এখন, তারপর গ্রামোফোনের পালা বল গান বল, যা হোক লিখে টাকাটা তুলতে হবে। তুমি ভাই, এ কাজ করেছ শুনেছি, আমার উপায়টাও তোমাকে বাতলাতে হবে।

বুঝিলাম, যোগেশ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছে। তপনকে সে ঠেলিয়া এক গলা পাঁকের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। আমার বাড়ির সেদিনকার দৃশ্য মনে হইল—নিয়তির পরিহাস ইহাকেই বলে।

দ্বিপ্রহরে দুইজনে দেখিয়া শুনিয়া "শশধর মিউজিক মার্ট" হইতে নূতন মেশিন একটা লইয়া আসিলাম এবং সন্ধ্যায় পুরাতনটিকে বিদায় করিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত সকলে মিলিয়া গান শুনিলাম। উত্তেজনায় সারারাত্রি ভাল করিয়া ঘুম হইল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে স্নান-আহারাদির পর ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা স্কুলে; ভাবিলাম, এই ফাঁকে একটু গড়াইয়া লইব। কিন্তু ভগবান-গ্রামোফোন বাদ সাধিলেন—একে একে পরিচিত এবং আত্মীয়-প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন, এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেঝেয় পাতা ফরাশের উপর গ্রামোফোন, রেকর্ড, বাদক ও শ্রোতাদের লইয়া আর তিলধারণের ঠাঁই থাকিল না। আমি হাঁটু ও তাকিয়া আশ্রয় করিয়া কোনও রকমে ঝিমাইতে লাগিলাম; মাঝে মাঝে আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইলাম, তপন নিশ্চিন্ত মনে সটকায় মুখ দিয়া চোখ বুজিয়া গোঁসাইজীর আলাপ শুনিতেছে।

গানের নমুনা এবং গ্রামোফোনে গান দেওয়া সম্পর্কে অন্যান্য উপদেশ দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পরে এই কৌপীনের ইতিহাস খুব দীর্ঘ নয়। প্রত্যেক ডাকে করুণ, রুদ্র, ব্যঙ্গ, নানা জাতীয় গান আসিতে লাগিল, বিখ্যাত গায়ক অমুক চট্টোপাধ্যায় এবং গায়িকা মিস অমুকার মুখে তাহার অধিকাংশই আপনারা শুনিয়াছেন। শেষে আর শুধু গানে এবং ডাকে কুলাইল না।

ডাক্তার তপন মুখোপাধ্যায় মরিলেন; কিন্তু প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচয়িতা "মীনকেতন"কে আজ এই সিনেমা-রেডিও-গ্রামোফোন-মুখরিত শহরে কে না চেনে? অন্ধ গায়ক রাধানাথের মুখে তো তাঁহারই গান শুনিয়া আপনারা পাগল হইয়াছেন, এবং তাঁহারই রচিত পালাগান 'নদের নিমাই' শুনিয়া অশ্রু বিসর্জন করেন নাই—এমন পাষণ্ড তো বড় দেখিলাম না। যে গ্রামোফোন কোম্পানির সহিত আমিই বহু সুপারিশ করিয়া তাঁহার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলাম, সেখানে এখন মীনকেতনের অসাধারণ প্রতিষ্ঠা। কেয়া পাঁচ-দশখানা রেকর্ড ভাঙিয়া ধমক খাইয়াছিল, তপন মুখুজ্জের রেকর্ড এখন সকলের রেকর্ড ভঙ্গ করিতেছে।

একটা ব্যঙ্গ-গল্পের ফরমাশ ছিল। দ্বিপ্রহরে বসিয়া বসিয়া পাঁচজন পাঠককে হাসাইবার মত প্লট ভাবিতে ভাবিতে চোখে প্রায় জল আসিয়াছিল। হঠাৎ টেলিফোনে কে ডাকিল! অবাক কাণ্ড, তপন কলিকাতায় আসিয়াছে, কিন্তু আমার এখানে উঠে নাই! কবে আসিল? "ভাগীরথী গ্রামোফোন কোম্পানি"র স্টুডিও হইতে ফোন করিতেছে। আমাকে এখনই যাইতে হইবে।

ব্যঙ্গ-গল্প পড়িয়া রহিল, গেলাম "ভাগীরথী গ্রামোফোন কোম্পানি"র অফিসে। সেখানে ইতিপূর্বেও বহুবার গিয়াছি, কিন্তু এমন খাতির পাই নাই। তপনকে দেখিলাম, সে তপন আর নাই, কোম্পানি হইতে তাহার জন্য একটি বিশেষ ঘর নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেখানে বসিয়া সে 'মমতাজ' নামক পালা-গান রচনা করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই সশব্দে অভ্যর্থনা করিল এবং কুশল-প্রশ্নাদির পরই বলিল, শ্রীমতীর ইচ্ছে একটা রেডিও-গ্রামোফোন নিয়ে যাই, বলেছি মিঃ চৌধুরীকে, পনরো শো টাকার কমে ভাল মেশিন হয় না, একটা নিয়ে যেতেই হবে। চল না, মেশিনটা একটু বাজিয়ে দেখা যাক।

অদৃষ্টের পরিহাস! কৌপীন দেখিয়াছিলাম, রাজবেশ দেখিতেও আমাকেই যাইতে হইল। ফিরিবার পথে তপন হঠাৎ বলিল, হাস্নুহানা ফিল্ম কোম্পানি একটা অপেরা

লিখে দিতে আর ডিরেক্ট করতে বলছে, মোটা টাকা, বুঝলে হে! শেষ পর্যন্ত দেখছি কলকাতায় এসে বসবাস না করলে চলবে না।

আমার বাক্যস্ফূর্তি হইল না। পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নয়। যোগেশের কথাই ঠিক—সব লাল হো যায়গা! সিনেমা রেডিও এবং গ্রামোফোনই শুধু থাকিবে, মানুষ থাকিবার প্রয়োজন নাই। চকিতে সেই কৌপীনধারী সংসারবিবাগী সন্ন্যাসীর কথা মনে হইল। দেখিলাম, গভীর অরণ্য বিস্তীর্ণ জনপদে পরিণত হইয়াছে এবং তিনি আত্মীয় পরিজন মার্জার গাভী ইত্যাদি পরিবৃত হইয়া এখনও তপস্যা করিতেছেন।

দেখে যা পাগলী

রামহরি চাটুজ্জে আজ বিশ বৎসর ধরিয়া উল্টাডিঙি স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ; বেতন সাড়ে বাইশ টাকা, কিন্তু বিশ্রাম নাই। দিন ও রাত্রির সকল প্রহরেই একটা না একটা ট্রেন হয় এদিক, নয় ওদিক—থামিবার বালাই নাই, গমগম করিয়া ছোট্ট স্টেশনটির বুকের উপর দিয়া ছুটিয়া যায়। রামহরিকে প্রত্যেকটি ট্রেন পাস করাইবার জন্য স্টেশনে হাজির থাকিতে হয়। রামহরির ভালই লাগে।

কিন্তু পত্নী কালীতারা গোল বাধায় ; বলে, মুয়ে আগুন এমন চাকরির। রেতে ঘুম নেই, দিনে বিশ্রাম নেই, খালি ডিউটি আর ডিউটি। তবু যদি এক মিনিটের জন্যেও একটা থামত !

অপ্রস্তুত রামহরি একগাল হাসিয়া বলে, পাগলী এও কি কম অনার রে ! দার্জিলিং মেল, শিলং মেল, চাটগাঁ মেল, লাটের স্পেশাল—আমি পাস না করলে কই যাক দেখি !

কালীতারা একটু চঞ্চল হয়, বুকটা স্বামী-গর্বে যে একটু না ফোলে তা নয়, তবু অভিমান বজায় রাখিয়া বলে, ভারি তো অনার, তবু মাইনে যদি সাড়ে বাইশ টাকার বেশি হ'ত ; এর চাইতে বুকের পাটা থাকে, চল, শিয়ালদার মোড়ে পানের দোকান খুলি ; খেয়ে প'রে সুখ হবে।

এ বিষয়ে রামহরির বুকের পাটা সত্যই ছিল না। কালীতারা একে সুন্দরী, তায় বন্ধ্যা। বয়স ত্রিশ হইলে কি হয়, আঁটসাঁট গড়ন। না-থামা ট্রেনের গার্ড আর ড্রাইভারগুলা যে ভাবে লোলুপ দৃষ্টি হানিতে হানিতে যায়, রামহরির হাত নিশপিশ করিতে থাকে ; ভাবে, দিই একটা কয়লার চাপ ছুঁড়িয়া। কিন্তু কালীতারা তেমন নয়, জানালায় বড় একটা দাঁড়ায় না।

স্টেশনের খুব কাছেই কোয়ার্টার্স ; একতলা বাড়ি—দুইখানা ছোট্ট ছোট্ট কুঠরি ; একটুখানি বারান্দা, সেখানে রান্না হয় ; খানিকটা উঠান। এইখানেই রামহরি আজ কুড়ি বৎসর বাস করিতেছে। পয়েন্ট্স্ম্যান দুখিয়া অবসর সময়ে এটা সেটা ফাই-ফরমাশ খাটিয়া দেয়, জল তুলিয়া দেয়। সাড়ে বাইশ টাকাতেই কোনও রকমে চলিয়া যায়।

এমনই করিয়াই বেশ দিন যাইতেছিল। শোবার ঘরের দেওয়ালে কখন কোন্ ট্রেন আসিবে মিনিট ধরিয়া চার্ট করা আছে—দেখিয়া দেখিয়া কালীতারারও মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

সময়ের বদল হয়, রামহরি সঙ্গে সঙ্গে টুকিয়া রাখে। স্থানীয় লাইব্রেরি হইতে রামহরি রহস্যলহরী সিরিজের 'পিশাচ পুরোহিত' কিংবা 'রূপসী বোম্বেটে' অথবা ওই ধরনের একটা কোনও বই একটা টাকা জমা রাখিয়া লইয়া আসে। জোরে জোরে কালীতারাকে শুনাইয়া শুনাইয়া সে পড়িয়া যায়; কালীতারা পান সাজিতে সাজিতে অথবা দোক্তা গুঁড়া করিতে করিতে একাগ্র চিত্তে শোনে, হঠাৎ চার্টের দিকে চাহিয়া রামহরি লাফাইয়া উঠে, বলে, আমার পাৎলুন!

কালীতারা পাৎলুন পরাইয়া দেয়; রামহরি 'রূপসী বোম্বেটে'র পাতায় ছেঁড়া মাদুরের একটা কাঠি গুঁজিয়া দিতে দিতে বলে, খবরদার, তুমি নিজে প'ড়ো না বলছি— সিক্সটিন আপকে পাস ক'রে দিয়ে আমি এলাম ব'লে। বেল্ট আঁটিতে আঁটিতে রামহরি বাহির হইয়া যায়। কালীতারা উঠিয়া ভাতের ফেন গড়াইয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়ায়। মেঘে মেঘে রাত্রির অন্ধকার আরও কালো হইয়াছে। দূরে দূরে রাস্তার এবং বাড়ির ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাসের ভিজা আলো তাহার মনে মোহ বিস্তার করে। সে শ্রীরামপুরে তাহার বাপের বাড়ির কথা ভাবে। এত কাছে, কিন্তু এত দূর! দাদার ছেলেমেয়েরা কত বড় হইল! নন্‌কুর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হইল কি না! আহা, তাহার একটা মেয়েও যদি হইত! বসিয়া বসিয়া সময় আর কাটিতে চাহে না। কত আজগুবি কথা মনে হয়—ভাল, মন্দ। সামান্য একটা মেয়ে, তাহাকে সাজাইয়া-গুজাইয়া ধোয়া-পোঁছা করিয়া সময়টা কেমন করিয়া কাটিয়া যাইত! বুড়া বয়সে পুতুল খেলা আর ভাল লাগে না। প্রথম পাঁচ-সাত বৎসর সে খুব ঘটা করিয়া পুতুল খেলিয়াছিল। কিন্তু অন্য মানুষের পুতুলশাবক দুই-একটি না আসিয়া জুটিলে এ খেলাও জমে না। ছেলের বিয়ে, মেয়ের বিয়ে, ফুলশয্যা, পূজা, জামাই-ষষ্ঠীর তত্ত্ব—মাদুলিও তো সে কম লয় নাই! ঘোষপাড়ার শিবের কাছে ধন্নাও দিয়া আসিয়াছে—একটা সন্তান, একটা ছেলে—

পিছন হইতে রামহরি পাৎলুন খুলিতে খুলিতে হাঁকে, শেষ ক'রে ফেলেছ বুঝি? নাঃ, তোমাকে নিয়ে পারবার জো নেই, একাই পড়তে হবে আমাকে।

কালীতারা আলোটা উস্কাইয়া দেয়; পা ধুইবার জল গামছা। আসন পাতিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে বসে।

গোল বাধিল রামহরির মেজো শালীর অপ্রত্যাশিত আগমনে; নিটোল স্বাস্থ্যবতী যুবতী, একটিমাত্র পাঁচ বৎসরের শিশু কোলে; স্বামী সি. পি.তে বন-বিভাগে কাজ করে।

ঘুষ-ঘাষ লইয়া প্রচুর রোজগার, এবং সেই রোজগারের বার্তা শ্যালিকা সুহাসিনীর সর্বাঙ্গ ছাপাইয়া উপচিয়া পড়িতেছে। দিদির জন্য সুহাসিনী একটা পীস সমেত আলপাকার শাড়ি আনিয়াছিল—ধূলা পায়েই সে তাহা দিদিকে পরাইতে বসিয়া গেল। দেওর পৌঁছাইয়া দিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে; জামাইবাবু স্টেশনে। কালীতারা চোখের জল মুছিতে মুছিতে হাসিতে লাগিল। খোকাকে লইয়া সে যে কি করিবে!

শ্যালিকার আগমন-সংবাদে রামহরির প্রাণেও যেন নূতন যৌবনের জোয়ার আসিল। উল্টাডিঙি স্টেশনটাকেই মনে হইল, যেন শিয়ালদার চাইতে অনেক বড়; কিন্তু সে কথা কালীতারা না হয় বুঝিল, শ্যালিকাকে সে বুঝাইবে কেমন করিয়া? তাহার প্রতিপত্তির পরিচয় সে কি করিয়া দিবে?

আপ দার্জিলিঙ মেলকে বিদায় দিয়া রামহরি যখন বাসায় ফিরিল, তখন দুই বোনের মনের হিসাব-নিকাশ হইয়া গিয়াছে। দুঃখী কালীতারার দুঃখে সুহাসিনী কাঁদিতেছে। রামহরি ঘরে আসিতেই সুহাসিনী ঢিপ করিয়া তাহাকে একটা প্রণাম করিয়াই বলিল, সিগ্‌নাল ডাউন ক'রে দিয়ে এলেন তো দাদাবাবু, না, আবার এখুনি ছুটতে হবে? ধন্যি লোক আপনি যা হোক!

বুঝিতে না পারিয়া রামহরি ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কালীতারা বলিল, তুই থাম্ সুহাস, খেটে-খুটে এল—

সুহাস দাদাবাবুর জন্য গাড়ু গামছা ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল, পোড়া কপাল অমন খাটুনির, সবার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেড়ে এমন চাকরি না করলেই নয়! তার চাইতে চলুন আমাদের ওখানে, ওঁর হাতে অনেক চাকরি আছে। একসঙ্গে দু বোনে—

রামহরি আহত হইল। বিশ বছরের মোহ—এমন নিন্দার চাকরিই বা কি! শহরের কাছেই; ছুট বলিতেই কলিকাতায় যাওয়া যাইতেছে। বাপ রে, সি. পি.র জঙ্গলে সে যাইতে পারিবে না।

রাত্রে শোয়ার পর কালীতারা আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, যেখানে ট্রেন থামে না, সেখানকার স্টেশনমাস্টারের চাকরি লোকে নাই করিল!

কালীতারা এখান হইতে পলাইবার জন্য কেন ছটফট করিতেছে, রামহরি তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া? খোকাকে দেখিয়া অবধি কালীতারা নিজের কাছ হইতেও পলাইতে চায়—অসহ্য, অসহ্য; রেল-লাইনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু তাহার ধাঁধিয়া গেল।

রামহরি বুঝিল না, তাহার অভিমান হইল।

পরের দিন সকালে দার্জিলিং মেল পাস করিবে, সুহাস খোকাকে লইয়া স্টেশনে হাজির। বলিল, আপনার চাকরি দেখতে এলাম চাটুজ্জে মশাই।

রামহরি হঠাৎ প্রথমটা খুশি হইয়া গম্ভীর হইয়া গেল। সুহাস যে গায়ে পড়িয়া অপমান করিতে আসিয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তাহার মাথা গরম হইয়া গেল। দুখিয়াকে এক গ্লাস জল আনিতে বলিয়া সে ট্রেনের তত্ত্ব করিতে গেল। ইয়েস, টু নাইন সিক্স এইট। হাতলটা টিপিয়া দিতেই ঘড়াং ঘড়াং করিয়া দুই বার আওয়াজ হইয়া লাইন-ক্লিয়ারের বলটা বাহির হইয়া আসিল। লাল পতাকার উপর নীল পতাকাটি জড়াইয়া লইয়া টলিতে টলিতে রামহরি প্ল্যাটফর্মে আসিল। সুহাস ছুটাছুটি করিয়া খোকাকে খেলা দিতেছে; দুখিয়াও কাছে কাছে ঘুরিতেছে, বেটা সুহাসের গয়না-কাপড়ের জমকে ভুলিয়াছে।

রামহরির মাথায় যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কালীতারা বাসার দরজার বাহিরে আসিয়া আমগাছের আড়াল হইতে ব্যাপারটা দেখিতেছে। মাথায় আধঘোমটা। সে কি ভাবিতেছে, কে জানে!

সুহাস চাকরি দেখিবে! দেখ চাকরি। সে কি একটা কেউ-কেটা! তাহার হুকুম না পাইয়া ট্রেন কই যাক দেখি! নাগপুরের জঙ্গলে জঙ্গলে কাক তাড়াইয়া বেড়ানোর চাইতে এ অনেক ভাল। সেখানে কে কাহাকে খাতির করে! সুহাস একবার দেখিয়া যাক, কালীতারাও বুঝুক, কে বড়—ভগিনীপতি, না, স্বামী!

দূরে ধোঁয়া দেখা গেল; গমগম আওয়াজে সামনের লাইনগুলা পর্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। সুহাস খোকাকে টানিয়া লইয়া প্ল্যাটফর্মের ধার হইতে একটু ভিতরে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। কালীতারার মাথার গুণ্ঠন একেবারে খসিয়া পড়িয়াছে। স্টেশনে বেশি লোক নাই। রামহরির দুঃখ হইল। লাইব্রেরিয়ান অধরবাবু ভারি ঠাট্টা করে। ভদ্রলোক এই সময় থাকিলেই ভাল হইত।

দার্জিলিং মেল বিদ্যুৎগতিতে স্টেশন-ইয়ার্ডে প্রবেশ করিল, নিমেষমধ্যে প্ল্যাটফর্ম ছাড়াইয়া তাহাকে উপহাস করিতে করিতে কলিকাতায় গিয়া পৌঁছিবে। সুহাস পাশে দাঁড়াইয়া হাসিবে, কালীতারাও সম্ভবত মনে মনে ঠাট্টা করিতে ছাড়িবে না।

রামহরি হঠাৎ পাগলের মত নীল পতাকাটি পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া লাল পতাকাটি দুই হাতে ধরিয়া মাথার উপর তুলিয়া সবেগে ঘুরাইতে লাগিল। ভুল হ'ল বাবু, ভুল হ'ল বাবু।—বলিয়া দুখিয়া ছুটিয়া আসিল, কিন্তু ততক্ষণে কাজ হইয়া গিয়াছে। ঘড়াং

ঘড়াং ঘড় কোঁচ কাঁচ করিতে করিতে সেই লৌহ-সরীসৃপ থামিয়া পড়িয়া গজরাইতে লাগিল।

রামহরির সেদিকে দৃষ্টি নাই, সে তখনও পতাকা নাড়িতেছে আর মুখ ফিরাইয়া কালীতারার দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে, দেখে যা পাগলী, দেখে যা, আমার কথায় দার্জিলিং মেল থামে কি না! দেখে যা পাগলী, দেখে যা, দেখে যা পাগলী—

হৈ হৈ রব উঠিল। সুহাস বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। কালীতারা আত্মবিস্মৃত হইয়া ছুটিয়া স্টেশনের দিকে আসিতে লাগিল। উত্তেজনার পর দারুণ অবসাদে রামহরি তখন প্ল্যাটফর্মের উপর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

পা

পায়ের তলাতেই পড়িয়া আছি, তাই পা-জোড়া আর লক্ষ্যগোচর হয় না; অভ্যাসের ঘোরে চাপও অনুভূত হয় না। এ যেন অ্যাট্‌মস্‌ফেরিক প্রেসার, প্রতি স্কোয়ার-ইঞ্চি মাথার উপর কয়েক পাউণ্ড পরিমাণ ভার প্রতিনিয়তই চাপিয়া আছে, অথচ চতুর্দিকের চাপ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া মাথাটা চ্যাপটা হইতে দিতেছে না; ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করিয়া যে-কোন একটা দিকের চাপ সরাইয়া ফেল, মাথা তো মাথা, লোহার ক্যানেস্তারাও চ্যাপটা হইয়া যাইবে। কিন্তু গোল মাথা লইয়াও যখন গোলের নিবৃত্তি হইতেছে না, অকারণে মাথাটা থেঁতলাইয়া লাভ কি!

অ্যাট্‌মস্‌ফেরিক চাপের মত পা-জোড়াও সহ্য করিতেছি। অনেক কাল হইয়া গেল, অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ তেজ দেখাইয়া একটা দিকের চাপ হ্রাস করিয়া নিজেকে বিপন্ন করিব কেন? পা-জোড়া নাই ভাবিয়াই নিশ্চিন্তে চলাফেরা করিতেছিলাম। অকস্মাৎ কল চালাইয়া কে যেন খানিকটা ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি করিয়া বহুদিনবিস্মৃত পা-জোড়াকে প্রচণ্ডবেগে একেবারে কাঁধের উপর চাপাইয়া দিল। চকিত হইয়া উঠিলাম।

খবর পাওয়া গেল, পূর্ব-বঙ্গের কোথায় যেন এবং উত্তর-বঙ্গের জলপাইগুড়ি জিলায় মাটির উপর অতিকায় পায়ের ছাপ পড়িয়াছে। পায়ের মালিককে দেখিয়া একজন স্ত্রীলোক আতঙ্কে মূর্ছা গিয়াছে এবং একজন পুরুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। খবরের কাগজের খবর—অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। 'অমৃতবাজার' পারলৌকিক, ভৌতিক ও আজগুবি নানা খবর সরবরাহ করিয়া থাকেন—শুধু 'অমৃতবাজারে'ই নয়, 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে'ও খবরটা বাহির হইয়াছে শোনা গেল।

যথাসময়ে আমাদের রবিবারের আড্ডাতেও এই অবিশ্বাস্য খবরের ঢেউ আসিয়া লাগিল। তিল লইয়াই যেখানে তালগাছ-পরিমাণ ঢেউ উঠিয়া থাকে, সেখানে এই অতিকায় ব্যাপারে আলোড়নটা কি প্রকার হইবে, বুঝিতেই পারিতেছেন। প্রমথ ছোট্ট মানুষটি, চেঁচাইয়া, টেবিল চাপড়াইয়া, নেপোলিয়ান, বার্নার্ড শ ও চেস্টার্‌টনের দোহাই পাড়িয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, মনে হইল, যেন সে একসঙ্গে নেপোলিয়ান ও ডিউক অব ওয়েলিংটন সাজিয়া লড়াই আরম্ভ করিয়াছে। হৃদয়াবেগের আধিক্য হইলে বলাইয়ের তোৎলামি শুরু হয়, সে বলিল, ক-ক-কচু খেলে যা, এ নিয়ে এত হাঙ্গামা কেন? এ হচ্ছে বেরিবেরি আর ফাইলেরিয়ার ক-ক-কম্বাইণ্ড দেবতা—তাঁকে বেরিলেরিয়া বলতে

পার, মা শেতলা, ওলাবিবি, এঁদের সঙ্গে নতুন বিজিত রাজ্যে একটা টহল দিয়ে ফিরছেন, তাঁরই পদচিহ্ন। ফু-ফু-ফুরসৎ পেলে এ নিয়ে একটা রি-রি-রিসার্চ করতে প্রস্তুত আছি।

পরিমলদা বেশি কথা বলেন না; কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক রসিকতার পাঞ্চ তিনি, লারস্‌ফুকোর উইটের সঙ্গে স্টিফেন লিককের হিউমার পাঞ্চ করিলে যাহা হয়, তিনি তাহাই; সংক্ষেপে বলিলেন, পায়ের ব্যাপারই নয় এ, এ হচ্ছে সাধু হীরালালের কাণ্ড; সাধু+পাখী+কুমীর+স্টাড্‌বুল=পা। এই পায়ের মাপে জাপানে তৈরি হচ্ছে মোজা আর বের্লিনে জুতো। জাপান-জার্মানি প্যাক্টের এই হচ্ছে সূত্রপাত—

বিভূতিবাবু বাধা দিয়া অরবিন্দের কাছ হইতে একটা সিগারেট চাহিয়া লইয়া হঠাৎ পাখা বন্ধ করিলেন এবং পরিপাটি করিয়া সিগারেট ধরাইয়া লইয়া বলিলেন, ব্যাপারটা এত সোজা নয় মশাই, আসল গোলযোগ হয়েছে সেভেন্‌থ অ্যাস্ট্রাল প্লেনে, তারই ধাক্কা এসে লেগেছে আমাদের পৃথিবীতে। একটা ভাল মিডিয়াম পেলে, সিয়াঁসে বসলে এর একটা হদিস পাওয়া যেত।

দেবীদাসের কিন্তু সে মত নয়। যদিও সময়টা সকাল, তবুও সে একটা থিওরি দিতে ছাড়িল না। বলিল, কৈলাসে রাত আটটা বেজে যেতেই বিপন্ন মহাদেব এসেছিলেন একটু আবগারি-অভিযানে। হয়তো শিলিগুড়ি থেকে মনোহরপুকুরেও যেতেন, কিন্তু যাকগে—বরাতটা কদিন ভাল যাচ্ছে ভাই, যাই, দেখি, বকুলবাগানে এক হাত খেলে আসি।—বলিয়াই সে চেয়ারের উপর ডান পাটা তুলিয়া দিয়া 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'টা তাহার উপর রাখিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে ক্রস-ওয়ার্ড পাজ্‌ল সমাধানে মনোনিবেশ করিল।

নীরদবাবু ও যমদত্তও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; পা জিনিসটা তাঁহাদের জুরিস্‌ডিক্‌শনের মধ্যেই নয়; নীরদবাবুর মিউজিক ও মার্শ্যাল রেসেস অব ইণ্ডিয়া; যমদত্তের স্ট্যাটিস্‌টিক্স ও মুসলমান—এই চারি বস্তু লইয়া দুইজনে কোনও গভীর সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকিবে; কারণ, দেখা গেল, নীরদবাবু পা দিয়া টেবিল ঠেলিয়া চেয়ার দোলাইতেছেন এবং যমদত্ত মাটিতে পা ঠুকিতেছেন।

যতগুলি লোক ছিল, পর পর ততগুলি মতের উদ্ভব হইল; কিন্তু কোন একটা নির্দিষ্ট মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না। হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে অযোধ্যা সিংকে লইয়া খুড়দার আবির্ভাব, তিনি আসিয়াই আসর অধিকার করিলেন এবং তেরো মিনিটের মধ্যে পা সম্বন্ধে তিন শো বিরানব্বইটা অকাট্য যুক্তি দাখিল করিয়া আমাদিগকে যুগপৎ বিস্মিত ও চকিত করিয়া তুলিলেন। নির্মলদা, শান্তি পাল, গণেশ ও প্রফুল্ল লাহিড়ী কখনও কথা বলেন না, মনে

হইল, তাঁহারাও উত্তেজিত হইয়াছেন। হরিপদ্দা শুধু খুড়দার যুক্তিপরম্পরার অসারতা বুঝাইবার জন্য হোমিওপ্যাথিক রসিকতার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। রূপলাল ট্রেতে করিয়া পেয়ালা পেয়ালা চা সরবরাহ করিতে লাগিল—চা চুরুট আর সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কথার স্ফুলিঙ্গ মিশিয়া সেই অতিকায় পা-টাই যে কোথায় উড়িয়া গেল, একটু হুঁশিয়ার হইতেই দেখি, আধুনিক ছোটগল্প লইয়া তারাশঙ্কর ও সম্বুদ্ধ প্রায় হাতাহাতি শুরু করিয়াছে। দেবীদাস পাঁচ খিলি গুণ্ডি পান বাঁ হাতের মুঠায় ধরিয়া একটা ছেঁড়া পানের পাতার উপরে সংলগ্ন চুন দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় লাগাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে এবং বীরেন ভদ্র, সুবল ও রামকমলদা নেপথ্যে ফিসফিস করিয়া সম্ভবত মেদিনীপুর সম্বন্ধে কি একটা আলোচনা শুরু করিয়াছেন—অতিকায় পা-প্রসঙ্গটাই বরাবরের মত চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ব্রজেনদা "সতীশ, আমার আধ কাপ" হাঁক দিয়া 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র কপি মিলাইতে বসিয়াছেন ; নলিনীদা 'প্রলয়-নাচন'-জাতীয় কি একটা গান গাহিতেছেন ও চৈতন্য চাটুজ্জে তাঁহার পোর্ট্রেট আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছে।

এমন সময় হঠাৎ জেকিল দাসের গাড়ি চাপিয়া পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত। গাড়িতেই কোনও হাসির কথা হইয়া থাকিবে, দেখিলাম, পবিত্রদা একসঙ্গে ডান হাতের বুড়া আঙুল দিয়া বাঁ হাতের তেলো ঘষিতে ঘষিতে এবং কাঁধের কাছে হাত বুলাইতে বুলাইতে আসিতেছেন। ইঙ্গিতে জেকিল দাসকে দেখাইয়া আমার কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া চুপিচুপি বলিলেন, পা।

জেকিল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, আবার পা ?

সত্যই তো, আবার পা। নীরদবাবু ততক্ষণ বাংলা দেশের শিক্ষার অসারতা প্রায় প্রতিপন্ন করিয়া আনিয়াছেন ; এবং পৃথিবীতে পাটই যে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—খুড়দারও তাহা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় নাই ; যমদত্ত ফিফ্‌টি-ফাইভ পার্সেণ্টকে স্ট্যাটিস্‌টিক্স-মাহাত্ম্যে প্রায় জিরোতে দাঁড় করাইয়াছেন এবং মনোজ 'ই-আ' 'ই-আ' বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরিমলদা জেকিলের কাছ হইতে দুই হাত তফাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, থিম্‌টা ভাল ছিল ; জুতমত—

জেকিল ইতিমধ্যে একটা চেয়ার ও একটা পেয়ালা উল্টাইয়া ফেলিয়াছেন। পরিমলদা ব্রজেনদার আড়ালে আত্মরক্ষা করিয়া বলিতেছেন, পায়ের কথাটা ব্রিটানিকার কোন্ ভ্যলুমে আছে জেকিলদা ?

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই পা-প্রসঙ্গ। বীরেন ভদ্র বলিল, ওসব কিছু না বাবা, দেশের ঘানিতে যত তেল বেরোয় তার সবখানি খরচ হয়—হয় কর্পোরেশনে, নয় ইউনিভার্সিটিতে; চানের সময় তেল না পেয়ে পেয়ে অশ্বত্থামা-বাবাজীর চাঁদি ফাটবার উপক্রম, তিনিই এসেছিলেন তেলের খোঁজে।

জেকিল বলিলেন, ঠাট্টা নয়, ও পা আমি দেখেছি।—তিনি টেবিলের এক ধারে পা তুলিয়া দিয়া চেয়ার দোলাইতে আরম্ভ করিলেন।

আমরা সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, ইয়ার্কি নয়, ও হচ্ছে বাংলাবাজার-জায়াণ্টের পা। আমার যখন দশ বচ্ছর বয়স—। বলিয়াই তিনি সম্ভবত বাংলাবাজার-দৈত্যের চেহারাটা মনে করিয়া নিজেই বেসামাল হইয়া হাসিতে শুরু করিলেন এবং হাসির আতিশয্যে পরিমলদার হাতটা অতর্কিতে ধরিয়া কামড়াইতে গেলেন। ঠেলাঠেলি মারামারি—একটা যেন ঝড় বহিয়া গেল। সবাই থিতাইয়া বসিলে জেকিল বলিলেন, পাড়ায় যাত্রা হচ্ছিল, লোকে লোকারণ্য। সামিয়ানার চারদিকে সারি সারি লোক। কোন্ ফাঁকে বাইরে এসেছিলাম, আর ঢুকতে না পেরে মনের দুঃখে এদিক ওদিক ঘুরছি, হঠাৎ একটা হৈ হৈ শুনলাম। দেখি, বিকটাকার দৈত্যের মত একটা লোক ভিড়ের মধ্যে দু হাত ঢুকিয়ে যেন পানা সরিয়ে অবলীলাক্রমে ভেতরে ঢুকছে, আশেপাশের লোকগুলো ছিটকে দু ধারে স'রে যাচ্ছে। জায়াণ্টের পেছনে পেছনে আমিও ঢুকে পড়লাম। কিন্তু যাত্রা আর জমল না, লোকে যাত্রা শুনবে কোথায়, হাঁ ক'রে সেই বিরাট মূর্তিকেই দেখতে লাগল। এ পা তার না হয়ে যায় না।

বলাই হঠাৎ প্রশ্ন করিল, জেকিলদা, তার বিয়ে হয়েছিল?

রসিকতাটা বুঝিতে বাঙাল জেকিলের একটু সময় লাগিল, কিন্তু বোঝামাত্র সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড!

সমস্ত দিন মাথার মধ্যে "পা" ঘুরিতে লাগিল। নাগরা এবং জুতার চাপেই আজ হাজার বৎসর কাবু হইয়া আছি—খালি-পা কি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত? সিভিলিজেশনের রাজত্ব বুঝি শেষ হইয়া আসিল; অরণ্য-প্রান্তর-পর্বতবাসী বর্বর "নোমাড"দের বিজয়যাত্রার সূত্রপাতে কি এই নির্মম তিন ইঞ্চি ডিপ, বাইশ ইঞ্চি লম্বা পদচিহ্ন? বীরেন চাটুজ্জে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, ও কিছু না, ঝিনঝিনিয়ার আফ্‌টার এফেক্ট; প্রমথ বলিয়াছে, চেস্টার্‌টন; ব্রজেনদা রামরাম বসুর নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু আসলে সে ভদ্রলোক পায়ের

চাইতে মাথার কারবার বেশি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত বিষয় উহা নয়, পলিটিকাল-মাইণ্ডেড বাঙালীর কাছে ঠিক ইলেক্‌শনের মুখে ব্যাপারটার সিগ্‌নিফিকান্স যে কতখানি, তাহা ভাবিয়া দিনের কাজের মধ্যেও মাঝে মাঝে উতলা হইয়া উঠিতেছিলাম। এ পা আর যাহারই হউক, হিন্দুর নয়। মুসলমানের হইতে পারে, পার্সেণ্টেজের জোরে পায়াভারী হইতে কতক্ষণ! ইংরেজের না হওয়াই সম্ভব। যে পা অলক্ষিতে এমন জুতসই গুঁতাইতে পারে, লক্ষ্যে আসিয়া হাঙ্গামা বাধাইবার আবশ্যকতা তাহার নাই। মোটের উপর, মাথার মধ্যে একটা দারুণ অস্বস্তি লইয়াই শুইয়া পড়িলাম। আমার ভাবগতিক দেখিয়া গৃহিণী একটু অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু পাছে কাগজে তাঁহার নামে বেফাঁস কিছু লিখিয়া দিই, সেই ভয়ে আমাকে ঘাঁটাইতে সাহস করেন নাই। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, তিনি শুইয়া শুইয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিরাট পূজা-স্পেশালখানা কি ভাবে দুই হাতে ধরিয়া পড়িতে পারা যায়, সে বিষয়ে নানা কসরৎ করিতেছেন।

*   *   *   *

অতি-আধুনিক কোনও এক সাপ্তাহিক পত্রিকার অফিস। টেবিলের চারিদিকে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত চেয়ারে তরুণ ও তরুণীরা বসিয়া দিগম্বরী-স্বাস্থ্য ও সুপ্রজনন-বিদ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। দেওয়ালে চারিদিকে দিগম্বর-দিগম্বরীদের পূর্ণ ও ভগ্নাংশ চিত্র; দেহভঙ্গির এমন অপরূপ লীলা থিয়েটারের গ্রীন-রুমেও দেখা সম্ভব নয়। আলোচনাকারীরা কিন্তু কেহই দেওয়ালবিলম্বিত আদর্শ-অনুযায়ী সজ্জিত ছিলেন না, মোহিনী বা ঢাকেশ্বরী মিলের মায়া তাঁহারা তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আমাকে কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। আমি চুপ করিয়া নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে এক ধারে বসিয়া আলোচনা শুনিতে লাগিলাম। সুপ্রজনন-বিদ্যা হইতে কথাবার্তা ক্রমশ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় আসিয়া পৌছিল—তারপর ছবির প্লেট। স্বাস্থ্যবতী রূপসীর নগ্নতা কটি হইতে হাঁটু পর্যন্ত হরতনের অথবা রুহিতনের টেক্কার মধ্যে ভাল খুলিবে, কায়া হইতে ছায়া কত গুণ বড় হইলে নগ্নতা পুলিসের খপ্পরের বাহিরে যায়—ইত্যাদি প্রসঙ্গ শুনিতে মন্দ লাগিতেছিল না। হঠাৎ এক অতি মিহিমার্কা তরুণ—আভাসে বুঝিলাম, তিনি সহ-সম্পাদক—টেবিলে রক্ষিত একটি চামড়ার ব্যাগ হইতে একটি পত্র বাহির করিয়া সম্পাদকের হাতে দিয়া পত্রিকার চিঠিপত্র-বিভাগে তাহা ছাপা যায় কি না, প্রশ্ন করিলেন। 'ভাগ্যচক্র'-প্যাটার্ন একজন তরুণী চিঠিটি পড়িতে অনুরোধ করাতে সহ-সম্পাদক মহাশয় পড়িলেন—

৺রামকান্ত আঢ্যের বাড়ি
হড়িয়াখালি
সোমবার

নিবেদন,

আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অনেক বাধা কাটিয়ে আপনাদের কাগজ নিয়মিত পড়তে পাই। আপনাদের লেখা পড়তে এবং ছাপা ছবি দেখতে আমার বড় ভাল লাগে। লেখাপড়া ভাল জানি না। তবু পড়তে পড়তে আমার মন ছোটে আপনাদের আপিসে। ইচ্ছে করে, পাখী হয়ে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি। সম্ভব অসম্ভব কত কথায় আমার বুক ভ'রে ওঠে। আপনাদিকে যাচাই ক'রে দেখতে ইচ্ছে হয়। স্ত্রী ও পুরুষের স্বাস্থ্য ও দেহ-সৌন্দর্যের কথা কি স্পষ্ট ক'রেই যে আপনারা লেখেন! আপনাদের ছবি দেখতে পাই না। আপনারা নিশ্চয়ই খুব সুস্থ ও সুন্দর। কিন্তু কই, আপনারা গায়ের জোরের কথা, শক্তির কথা লেখেন না তো!

স্বামীর মৃত্যুর পর আমি পাঁচ সাত জনকে আপনাদের লেখামত যাচাই করেছি—রূপ আছে, দেহ-সৌন্দর্য আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফাঁকি ধরা পড়ে। মাকালফলে আমার কাজ নেই, শিব-পূজোয় বেল লাগে এবং আমি কাক নই।

আমার কথা বুঝতে পারছেন না, বোধ হয়! অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আমি, গুছিয়ে সব বলতে পারি না। গত এগারো বছর ধ'রে আমি একজন শক্তিমান পুরুষের কামনা করছি—শয়নে স্বপনে। পাড়াগাঁয়ে থাকি, মাসী-পিসী-দিদিমাদের নজর এড়িয়ে চলতে হয়, টোকা দিয়ে বেড়া কাটার লোকেরও অভাব নেই। মাছও খাই না, তুলসীতলায় প্রণামও করি, কিন্তু বুকে বড় জ্বালা।

বেশ ছিলাম। কুক্ষণে হারাণ চক্রবর্তী আপনাদের কাগজখানা একদিন বেড়া টপকিয়ে ঠিক আমাদের দাওয়ায় ফেলে দিয়ে গেল। ভাতের হাঁড়িটা নামিয়ে ফেন গালছিলাম, হঠাৎ শরীর মন ছ্যাঁত ক'রে উঠল—কাগজখানা হাতে নিয়েই মনটা হু-হু করতে লাগল। সেই থেকে খুঁজছি। সে কি খোঁজা! এক দিকে খুঁজি, আর এক দিকে পাঁজির পাতার বিজ্ঞাপন দেখে দেখে হতাশ হই, আপনারা যা লেখেন, তা যদি সত্যি হয় তো ওগুলো কেন? কুসুম ভালবাসি, কিন্তু কীট তো সহ্য হয় না।

আচ্ছা, শক্তি না থাকলে মানুষ কি সুন্দর হয়? ওপরের সৌন্দর্যটা তো ফাঁকি। সুন্দর আমিও, ঘাটে যখন জল আনতে যাই— যাক্, সে কথা নাই বললাম। আমার ছবি

যদি আপনাদের মত ক'রে ছাপেন, তা হ'লে আপনাদের অনেক ছবিই বাতিল হবে। হাসছেন বোধ হয়। মাইরি বলছি; কিন্তু আমার লজ্জা করে।

কিন্তু তবু তো আমি শান্তি পাই না। স্বামীকে মনে পড়ে না, অস্পষ্ট স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চাই না, একটা শক্ত কিছু ধরতে চাই; যে আমাকে পায়ের তলায় চেপে রাখবে, থেঁতলে দেবে, গুঁড়িয়ে দেবে—গুঁড়ো হয়ে ধুলোয় মিশে যেতেও সুখ।

আপনাদের কাগজে মেয়েদের নাম নিয়ে যাঁরা লেখেন, তাঁদের আমার দেখতে ইচ্ছে করে। তাঁরা লেখেন তো অনেক কিছু, কিন্তু সুখশান্তি পান কি? পান না নিশ্চয়ই, পেলে মুখও ফুটত না, কলমও ছুটত না; আমার মতই হতভাগী তাঁরা, আঁকড়ে ধরবার পা পান নি, তাই হাওয়ায় এখনও ফুরফুর করছেন। তাই আপনাদিকেও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, খাঁটির সঙ্গে ফাঁকি কি মেলে?

নিজের কথা একটু বলি, হারাণ চক্রবর্তী রসিক, বিধবা-বিয়ের অনেক পুঁথি আমাকে পড়তে দিয়েছে; কিন্তু থেতলে দেবার মত পা ওর নয়, বড় জোর ও হাত ধরতে জানে; আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে আরও দু চার জন আছে, কিন্তু আমার পছন্দ নয়। আপনারা তো অনেক কিছুর সন্ধান রাখেন, একটা পায়ের সন্ধান দেবেন?

নিঃ

আপনাদের অভাগিনী

মাতঙ্গিনী দাসী

চিঠি পড়া শেষ হইতেই ডিরেক্টরি ও ম্যাপের খোঁজ পড়িল; আমিও মনে মনে ঠিকানাটা আওড়াইতে আওড়াইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

মাতঙ্গিনী অনেক দুঃখেই পায়ের কথা লিখিয়াছে, তাহার নিন্দা করিতে পারি না। সারাটা পথ অন্যমনস্কভাবে সেই পায়ের কথা ভাবিয়াই চলিতেছিলাম, বাংলা দেশের সকল মাতঙ্গিনীর তরফ হইতে একটা ব্যাকুল কাতর প্রার্থনা যেন সমস্ত আকাশ বাতাস করুণ করিয়া তুলিয়াছিল। বিজ্ঞাপনে অক্ষমতা প্রমাণ করে, কিন্তু প্রতিষেধক কোথায়?

সত্যই তো আশ্রয় নাই, আঁকড়াইবার মত শক্ত মোটা একটা পা, নির্ভর করিয়া যাহা ধরিতে পারি; সার্ আশুতোষ দেহত্যাগ করিয়াছেন, সবল শক্ত একজোড়া পা সেই সঙ্গে গিয়াছে, সে পা তরাইতে পারিত, লাথি মারিয়া তাড়াইতে জানিত। রবি ঠাকুরের পা মোজায় মোড়া, বেচারী বৈষ্ণবীও সে পা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। মাতঙ্গিনীর জন্য কষ্ট হইল।

হড়িয়াখালি যাইব ? ম্যাপে যে রকম দেখিয়াছি, তাহাতে ভরসা হয় না, হাঙ্গাম অনেক। তাহা ছাড়া তেমন শক্ত পা আমার নয়। মাতঙ্গিনী যদি ভুল করে ?

মাতঙ্গিনীর কথা ভোলাই নিরাপদ। পাঁজির বিজ্ঞাপন দেখিয়া লাভ নাই। তাহার চাইতে সচিত্র সাপ্তাহিকগুলি পড়া অনেক সোজা।

দিন যায়। হঠাৎ এক চায়ের দোকানে চা খাইতে যাইয়া খবর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পা দেখা গিয়াছে। আমার মুখের ভাব গোপন করিতে পারি নাই। পার্শ্বোপবিষ্ট একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, মশায়ের বাড়ি কি হড়িয়াখালি ?

হড়িয়াখালি! কাগজটা এক রকম ছিনাইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া খবরটার সন্ধান করিলাম, হড়িয়াখালিই বটে। জয় মাতঙ্গিনীর! তাহার দুরন্ত ব্যাকুল কামনা সেই অজ্ঞাত অনির্দিষ্ট পায়ের টনক নড়াইয়াছে, পদচিহ্নই তাহার প্রমাণ।

ছুটিয়া গেলাম সেই সাপ্তাহিকের অফিসে। পা—পা! মাতঙ্গিনীর চিঠিও আসিয়াছে। খবরের কাগজের খবরে ভুল ছিল। সে লিখিয়াছে—

ঠাকুরকে প্রণাম, আশ্রয় করিবার মত চরণ পাইয়াছি। আমার জন্মজন্মান্তরের তপস্যা সফল হইয়াছে। আপনাদের জন্য আজ আমার কষ্ট হইতেছে। আর যাঁহারা মেয়েদের নাম লইয়া আপনাদের কাগজে লেখেন, তাঁহাদিগকে একবার কাছে পাইলে পায়ের জোর দেখাইতাম। সোনা ফেলিয়া তাঁহারা আঁচলে গেরো দিতেছেন। হতভাগীরা নিজেদের অভাবের কথাও জানেন না।

হারাণ চক্রবর্তী নাছোড়বান্দা, তাহাকে প্রায় কথা দিয়া ফেলিয়াছিলাম। ঘাট হইতে ফেরা অবধি ঠাকুর-ঘরের মেঝেয় আঁচল পাতিয়া শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিলাম। জীবনটা আর রাখিব না—এইরূপই স্থির করিতেছিলাম, বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি ? আপনাদেরও আর কোনও খবর দিই নাই।

একরকম নিশ্চিন্ত হইয়াই সন্ধ্যাদীপ হাতে তুলসীতলায় প্রণাম করিতে গেলাম। সেই পা-কেই মনে পড়িতেছিল, প্রণাম সমাপনান্তে মাথা তুলিতেই দেখি—বলিলে বিশ্বাস করিবেন না, ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে আমার বাক্‌স্ফূর্তি হইল না। সেই পা! জয় জগন্নাথ, তিনি তবে কৃপা করিয়াছেন! তুলসীমঞ্চের সামনেই বার বার সেই পায়ে মাথা ঠুকিতে লাগিলাম—আপনারা আমার জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন, আপনাদের জন্যও কিছু প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছি।

আপনাদের আমি কখনও ভুলিতে পারিব না, কিন্তু তাঁহার কথা বলিতে পারি না—আপনারা আর আমাকে আপনাদের পত্রিকা পাঠাইবেন না। পড়িবার সময়ই হয়তো পাইব না। নমস্কার।

শ্রীমাতঙ্গিনী দেবী

পুঃ—হারাণ চক্রবর্তীকেও ছাড়িয়াছি, আপনাদেরও ছাড়িলাম। পা সকলের মঙ্গল করুন।

তরুণদের মধ্যে একজন হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া দেওয়ালে বিলম্বিত ছবিগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। সে এক লণ্ডভণ্ড ব্যাপার! পলাইয়া আসিলাম।

মাতঙ্গিনীকে একটি চিঠি লিখিব ভাবিলাম। তোড়জোড় করিয়া লিখিতে বসিব—হঠাৎ ঘরের বাতি নিবিয়া গেল। অস্পষ্ট অন্ধকারে অনুভব করিলাম—পা আমার সম্মুখেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম, ঠিক সিলিঙের কাছ হইতে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে বলিল, খুব ইয়ার্কি দিতে শিখিয়াছ, রসিকতা করিবার আর বিষয় পাইলে না? দাঁড়াও।

চড়টা উঠিয়াছিল কি না দেখিতে পাই নাই, ভয়ে আতঙ্কে আমি সেই অস্পষ্ট বিরাট পা-খানি জড়াইয়া ধরিলাম। গম্ভীর গলায় পা বলিল, ঢের হইয়াছে, পা ছাড়।

* * *

ঘুম ভাঙিতেই দেখি, গৃহিণী থতমত খাইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন, এবং আমি তাঁহার একটা পা জড়াইয়া ধরিয়া আছি। গৃহিণী বলিতেছেন, এ আবার কি ঢঙ! ঢের হয়েছে, পা ছাড়।

লজ্জিত হইয়া পা ছাড়িয়া দিলাম।

স্বপ্নদর্শন সহজ, কিন্তু পায়ের সমস্যা মিটিল কি? "পরিব্রাজক" নির্মলদা বলিয়াছেন, এ সংসারে পা-ই সত্য; তেল এবং চলা—এ দুই মায়া। ঠিক ভাল করিয়া যে পা ধরিতে অথবা লাথি ছুঁড়িতে পারিল, এ সংসারে তাহারই জিত। জয়দেবের কলমে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়াছিলেন, দেহি পদপল্লবমুদারম্; ফলে রাধিকা বেচারীকে আজীবন বিরহে কাঁদিতে হইতেছে। জাতি হিসাবে আমরা সমগ্রভাবে বহুকালাবধি পায়ের প্রতীক্ষায় আছি; এক দল পা-জোড়া জাপটাইয়া ধরিয়া থাকিব, আর এক দল লাথির দূরত্বে থাকিয়া লাথি খাইব—এই দুই পন্থা ছাড়া আমাদের মুক্তি নাই, কিন্তু মুশকিল এই যে, পা-টাই খুঁজিয়া পাইতেছি না। হয়তো একদিন পাইব, মাতঙ্গিনীর মত সেই দিনই আমাদের মুক্তি হইবে।

সুতরাং হে অলক্ষ্য পদযুগ, তুমি প্রকাশিত হও; আমাদের সকল সমস্যার সমাধান কর। যে পায়ের অস্তিত্বই নাই, আমাদের এক-তৃতীয়াংশ সেই পা-কে জড়াইয়া ধরিয়া আছে মনে করিয়া খুশি আছে, এবং বাকি সকলে তাহারই লাথি খাইতেছে ভাবিয়া গজগজ করিতেছে। পা লইয়া দুই দলেরই ভুল কবে ভাঙিবে? সাহিত্যে যাহার প্রকাশ মাতঙ্গিনী দেখিয়াছে, জীবনে আমরা তাহার প্রকাশ দেখিতে পাইব কি?

* * *

এই গল্প প্রকাশের দীর্ঘকাল পরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে এই পা-জোড়া আবার দেখা গেল; এবারে মাতঙ্গিনী নয়, রামচন্দ্র নামধেয় একজন নিরীহ গোবেচারা ভদ্রলোক পায়ের সন্ধান পাইলেন। ঠিকানাটা আমাদের শিল্পীবন্ধু ভাস্কর দেবীপ্রসাদের বাড়ির কাছাকাছি; তিনিও তখন ছুটি লইয়া এখানে অবস্থান করিতেছিলেন। বন্ধুবর ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করকে লইয়া সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্য দেবীপ্রসাদের স্টুডিওতে হাজির হইলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, দেবীপ্রসাদ তাঁহার সদ্যনির্মিত "ধ্বংসের দেবতা"র মূর্তির সম্মুখে সাধকের মত বসিয়া আছেন। উপর হইতে আকণ্ঠ মূর্তি, পায়ের দিকটা ছিল না। তারাশঙ্কর রসিকতা করিয়া বলিলেন, ওঁরই পা।

যুদ্ধ তখন নয় মাস চলিয়াছে, প্রথমে কথাটা শুনিয়া ভয় হইল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, মাতঙ্গিনীর প্রসাদ-ভিক্ষা নিষ্ফল হইতে পারে না; তিনি আমাদিগকেই তরাইতে আসিয়াছেন। ভবানীপুরে তাঁহার উদয় খুবই অর্থপূর্ণ।

দেবীপ্রসাদ আমাদের সর্বাঙ্গে ল্যাভেণ্ডার ছড়াইতে ছড়াইতে বলিলেন, বশ।

ইহার পর প্রকাশ্যে আর কিছু বলিতে সাহস হইল না; কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম, পায়ের মালিকের সাক্ষাৎ পাইলে একবার মাতঙ্গিনীর খবরটা জানিয়া লইতাম।

গান্ধী

মা বলেন, গান্ধী। বউদি বলে, গান্ধী। বিয়ের কথা কেউ পাড়ে না। অবনী অস্থির হইয়া উঠিল। ওদিকে প্রতিমার বাবা মা আর অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নন। সার্ধ তিন বৎসরকাল ঢিল ছুঁড়িয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, ঝি ও পিওনের খোশামোদ করিয়া, প্রাচীর টপকাইতে গিয়া হাঁটুর চামড়া ছিঁড়িয়া, গাড়ি ও ট্রামের পিছনে ছুটাছুটি করিয়া তরী প্রায় তীরে ভিড়িয়াছে, এমন সময়ে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত—গান্ধী। ভাল রে ভাল, গান্ধী তো গান্ধী—কি হইয়াছে? তাই বলিয়া লোকে হৃদয়ের এতবড় একটা সমস্যাকে তো বাতিল করিয়া দিতে পারে না! ঝড়ে জলে লীগের একটা খেলা কোনও দিন বন্ধ হইয়াছে? গান্ধী! ইলোপ্‌মেণ্ট নয়, গান্ধর্ববিবাহ নয়, তিন আইন নয়, ইণ্টার্‌কাস্ট ম্যারেজ নয়—এক্কেবারে আইনঘটিত সমাজঘটিত বিবাহ! তবু গান্ধী?

মা খাইতে বলিলেই বলে, ক্ষিদে নেই। রাত্রে যখন তখন উঠিয়া মায়ের ঘরের সামনে পায়চারি করিতে থাকে। কোনও দিন তিনি জানিতে পারেন, কোনও দিন পারেন না। যেদিন জানিতে পারেন, স্নেহার্দ্র কণ্ঠে হাঁকিয়া বলেন, কি রে অবু, এত রাত্রে পায়চারি করছিস কেন, ঘুমোগে যা না। অবনী বলে, ঘুম কি আসছে ছাই, বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে! মা শঙ্কিত হইয়া উঠেন, বলেন, কালই তা হ'লে জগবন্ধু ডাক্তারকে—

অবনী বারান্দা হইতে হাঁকিয়া বলে, ওসব ডাক্তারের কাজ নয় মা, ভাবছি চেঞ্জে যাব। ছেলের দীর্ঘশ্বাস বে-দরদী মাতার কানে যায় না। রাত্রিজাগরণ বৃথা যায়।

বউদির সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা। অবনী বলে, বউদি, বিয়ে দিচ্ছ না, ভাবছি, এবার মদ ধরব। বউদি বলেন, ধর না, সেখানেও পিকেটার এবং মেয়ে পিকেটার, তোমারই প্রতিমার বন্ধু, সুষমা চাটুজ্জে অ্যাণ্ড কোং—

বেশ, তা হ'লে ব'য়ে যাব।

বড় তো স্থিতিশীল হয়ে আছ ঠাকুরপো, ব'য়ে গেলে তো ব'য়েই গেল।

মিছে কথা ব'লো না বউদি, আমার মত ভাল ছেলে—

ভাল ছেলে তো ভলাণ্টিয়ার না হয়ে ঘরে কেন? জহরলাল, সুভাষ—

বিয়েটা ঘটিয়ে দাও, সুড়সুড় ক'রে জেলে যাব বউদি।

বেশ, তাই বল না তোমার দাদাকে। আমি বাপু, এই দুঃসময়ে তোমার হয়ে ওকালতি করতে পারব না।

তা পারবে কেন? হ'ত নিজের কেস! আর দাদারও কেমন ধনুর্ভঙ্গ পণ, ওঁর পাকা ধানে তো কেউ মই দিচ্ছে না! বাংলা দেশের ছেলে, সামান্য একটা বিয়ে করব, তাতেও—

দাদা কংগ্রেসকর্মী, দুই দুই বার জেল খাটিয়া আসিয়াছেন, তিনি বলেন, একটা হেস্তনেস্ত কিছু না হয়ে গেলে বিয়ে কারু করা উচিত নয়। 'ওয়ারে'র সময় বিয়ে হয় না।

হয় না বইকি! নিজে বউ নিয়ে ঘর করতে লজ্জা হয় না?

*　　*　　*

নিরুপায় অবনী শেষে ভলান্টিয়ার হইয়া জেলে যাইবে স্থির করিল। কিন্তু দোকানে পিকেট করা, খদ্দর বেচা তাহার ধাতে সহিবে না; তবু জেলে যাইতেই হইবে। অবনী উপায় ঠাওরাইতে লাগিল।

ভলান্টিয়ার হওয়া হইল না, অনেক চিন্তা করিয়া সে কিছু টাকা সংগ্রহ করিল এবং যথারীতি আটঘাট বাঁধিয়া একটা সাপ্তাহিক বাহির করিল, নাম দিল—গান্ধী। চার পয়সা দাম, নিজেই সম্পাদক, প্রকাশক, প্রিণ্টার; একটা নিতান্ত ওঁচা ছাপাখানায় টাকা আগাম দিয়া ছাপাইতে লাগিল। এক সংখ্যা, দুই সংখ্যা, তিন সংখ্যা। ক্ষ্যাপাকুকুর-মার্কা প্রবন্ধ, রক্তারক্তি কবিতা, বোমা বারুদ—

অবনী ধরা পড়িয়া জেলে গেল। ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড। যাইবার সময় বউদিদিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বলিয়া গেল, এবার ফিরে এসে ফাঁসি। দেখব, কোন্ সুখে দাদাকে নিয়ে ঘর কর। মা কাঁদিতেছিলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল, ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

প্রতিমার বাবা মা দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, প্রতিমাও আসিয়াছিল। প্রতিমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, আমি তোমাকে ছুটি দিলাম প্রতিমা, সেই নিতাই লাহিড়ীকেই বিয়ে ক'রে সুখী হও। প্রতিমা জবাব দিল না। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিল শুধু।

প্রেসিডেন্সি জেল, দশ দিন লাপসি খাইতে না খাইতেই অবনী দেখে প্রতিমা—খদ্দর বেচিয়া জেল।

বিবাহের লোভ আবার অবনীকে পাইয়া বসিল, হরিধন চাটুজ্জে আছে—পুরুতের বংশ। শালগ্রাম একটা কুড়াইয়া আনিলেই হইবে। জেলার শুনিয়া হাসিল, বলিল, দি আইডিয়া!

আইডিয়াই বটে, কিন্তু প্রতিমা রাজী হয় না, বলে, আগে দেশ স্বাধীন হোক।

দাদার ভূত! জেলখানার দেওয়ালে দেওয়ালে বউদিদির হাসিমুখ। অবনী মরিয়া, বলে, এবার আত্মহত্যা।

কিন্তু তাহার আগেই গান্ধী-আরউইন চুক্তি—খালাস। একই ভাড়াটে গাড়িতে দুইজন। হাত ধরিয়া প্রতিমাকে নামাইয়া, হাত ধরাধরি করিয়া মায়ের কাছে গিয়া প্রণাম। চোখের জলে মায়ের আশীর্বাদ। মাকে বলে, যাই, প্রতিমাকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। বউদিকে আড়ালে বলে, বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চললাম।

বউদি বলে, সে তো সেরে এলে ঠাকুরপো।

ঠিক যেন মেয়ে-জামাই। প্রতিমার মার আনন্দ আর ধরে না। বলেন, এই মাসের সাতাশেই একটা ভাল দিন ছিল বাবা। ভাবছি, তোমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে কাশী যাব।

* * *

গান্ধীজী রাউণ্ডটেব্‌ল কন্‌ফারেন্সে, অবস্থা অনেকটা নর্মাল। দাদা বলেন, যা করবে, চটপট ক'রে ফেল। রাউণ্ডটেব্‌লে সুবিধে না হ'লে কিন্তু—

অবনী বলে, শহর কলকাতা, দশ ঘণ্টার নোটিশে একটা কেন, দশটা বিয়ে হয়ে যায়।

বিবাহ হইয়া গেল, ফুলশয্যার রাত্রি, ভিড় সরিয়া গিয়াছে। বিছানার উপর ফুল ছড়ানো—ফুলে পিপীলিকা। প্রতিমা আর অবনী। অবনী ডাকিল, প্রতিমা, শেষ পর্যন্ত—। প্রতিমার হাত ধরিয়া টানিল। প্রতিমা নড়িল না, জবাব দিল না। একটা ফুল লইয়া ছিঁড়িতে লাগিল। অবনী জেল পর্যন্ত সহিয়াছে, কিন্তু আর নয়; বলিল, প্রতিমা!

প্রতিমা বলিল, গান্ধীজী—

অবনী তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল, আমি চললাম।

প্রতিমা বিস্মিত, বলিল, এতরাত্রে কোথায়?

রাত তখন তিনটা। অবনী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, বলিল, মহিষবাথান যেতে হবে, সেখানে তালগাছ কাটব। আবার পিছু ধাওয়া ক'রো না কিন্তু। দাদার কথাই ঠিক, একটা হেস্তনেস্ত কিছু না হ'লে—

প্রতিমা ভুল করিয়া ডাকিয়া উঠিল, মা!

কিন্তু অবনী ততক্ষণে শিয়ালদা স্টেশন। সেখানে রাত কাটাইয়া ভোরবেলা বাড়ি। বউদিদি সদর খুলিয়া দিয়া বলিল, এ কি ঠাকুরপো, পলাতক নাকি?

অবনী শুধু বলিল, গান্ধী।

শশিমোহনের রিসার্চ

মফস্বল শহর হইতে বি. এ. পাস করিয়া বাংলায় এম. এ. পড়িবার জন্য শশিমোহন যখন কলিকাতায় আসিল, তখনই সে কবি-খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। তথাকথিত পল্লী-কবিতা ও গান তখনও রেডিও-গ্রামোফোন মারফৎ মারাত্মক হইয়া উঠে নাই, ইট-কাঠ-প্রস্তর-পীড়িত শহরবাসীর মনে তাহা মোহই সৃজন করিত।

সুতরাং সপ্তদশ অশ্বারোহী নয়, সপ্তদশ রৌপ্যমুদ্রা লইয়া কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই শশিমোহন দেখিল, বাধাবিঘ্ন মায়ামন্ত্রে অপসারিত—এখন সোজা হাঁটিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিতে পারিলেই, বাস্—কেল্লা ফতে।

বাংলার রাজধানী গোলদীঘির তীরে অবস্থিত; সেনেট হলকে ডাইনে রাখিয়া সোজা গিয়া একটু কৌশলে বাঁয়ে যাইতে হয়, সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিলেই—রাজকোষ, মণিরত্ন থরে থরে সজ্জিত আছে। শশিমোহন সেই দিকে অগ্রসর হইল—শনৈঃ শনৈঃ।

মলিন শার্ট ও খাটো ধুতি পরিহিত লম্বা শশিমোহনকে সুতরাং কলিকাতার সাহিত্যিক ও পারিবারিক সভা-সমিতিতে ঘন ঘন দেখা যাইতে লাগিল; মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিকের অফিসে শান্ত চেহারাটি লইয়া প্রবেশ করিয়া এক কোণে নিরুপদ্রবে সে বসিয়া থাকে, সকলের অবসর হইলে ভূমিকামাত্র না করিয়া সে বলে, আমি শশিমোহন আঢ্য—পল্লী-কবি।

ভুঁড়ি হইতে গেঞ্জিটা তুলিয়া হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া সম্পাদক হয়তো প্রশ্ন করেন, আপনার কি কোন কবিতা—?

ঘাড়টা ডান দিকে একটু কাত করিয়া শশিমোহন বলে, আজ্ঞে না, একটা গান শোনাই?

ব্যাপারটা স্থানবিশেষে কৌতুকাবহ হইয়া উঠিলেও তিন মাস যাইতে না যাইতে পল্লী-কবি শশিমোহন সমাজে ও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িল। পাশ্চাত্য কৌশলী জাতেরা যে ভাবে প্রথম মিশনরি পাঠাইয়া পথ প্রস্তুত করিয়া হঠাৎ একদিন সৈন্য-সামন্ত লইয়া উপস্থিত হয় এবং স্থানীয় বিপক্ষ পক্ষকে ভাবিবার অবসর মাত্র না দিয়া রাজ্যবৃদ্ধি করিয়া বসে, শশিমোহনও তেমনই প্রথমে গান শোনায়, কবিতা আবৃত্তি করে, তারপর—

রাজ্যের যিনি প্রধান অমাত্য, তিনি তখন বৃহৎ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত—পুথির পাটা, কাঁথা, পট, চিত্রিত মাটির ভাঁড়—বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাংলা বিভাগ প্রায় আঁতুড়-ঘর হইয়া উঠিয়াছিল। শশিমোহন সভা-সমিতিতে হাজিরা দিতে দিতে ও গান গাহিতে গাহিতে বানান দুরস্ত করিয়া লইবারও সময় পায় নাই, অথচ পরীক্ষায় পাস করিতেই হইবে। মাসী পিসী যে যেখানে ছিল, সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। কাঁথা চাই, কাঁথা চাই—ছিন্ন মলিন সূক্ষ্ম স্থূল পুরাতন আধুনিক—। তাঁহারা ভড়কাইয়া গেলেন। প্রেমে পড়িয়া কলিকাতায় বিবাহ করে নাই তো? কিন্তু কাঁথা আসিতে লাগিল, কালীঘাটের পট, কুমারটুলির ভাঁড়—পুথির পাটায় আরও বুকের পাটা দেখাইল শশিমোহন, এবং একটা সন্ধ্যার মুখে মাঝেরহাট পুলের উপর দেখা গেল, কাঁধে মাথায় সর্বাঙ্গে কাঁথা জড়াইয়া, বগলে পাটা ও পট এবং হাতে ভাঁড় ঝুলাইয়া পল্লী-কবি শশিমোহন মন্থর গতিতে দক্ষিণে চলিয়াছে।

শশিমোহন এম. এ. পাস করিয়া গেল। এইবার—

কিন্তু তখন আর সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই, স্বনামখ্যাত কবি শশিমোহনকে রিসার্চ-স্কলাররূপে পাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ধন্য হইল। পল্লী-কবি শশিমোহন আদ্য পল্লীগাথা ও গীতি সংগ্রহে বাংলার হাট মাঠ চষিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রথম প্রথম দেশ-ভ্রমণে তাহার উৎসাহ ছিল। সরস্বতীপূজা উপলক্ষে কুষ্টিয়া স্কুলের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একজন সভাপতিরূপে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, সঙ্গে বাংলা দেশের দুই-চারি জন সাহিত্যিকও ছিলেন। সভার পরের দিন ভোরে নির্মল বায়ু সেবনের বাসনায় তাঁহারা ভৈরবের তীরে পদচারণা করিতেছেন, হঠাৎ ছাতি মাথায় শশিমোহনের সঙ্গে দেখা। একগাদা ছেঁড়া কাগজপত্র বগলে, হাতে পাঠশালার পড়ুয়াদের মত ঝোলানো দোয়াত। বিনীত নমস্কার করিতে গিয়া দোয়াতের কালি পড়িয়া শশিমোহনের কাপড়ে জামায়—

তাহা হউক, শশিমোহনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কালিলিপ্ত জামার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, বলিল, লালনশা ফকিরের দেড় শো গান পেয়েছি সার্, আর মারফতী গান, শুনবেন একটা?

ফলে শশিমোহন ম্যাট্রিকুলেশনের বাংলার পরীক্ষক নিযুক্ত হইল।

* * * *

এক বৎসর যায়, দুই বৎসর যায়, শশিমোহন রিসার্চ করে, অর্থাৎ মাসিক-পত্রিকায় কবিতা লেখে এবং বেকার বসিয়া থাকে; কিন্তু মানুষ বেকার থাকিতে পারে না।

একদল পল্লী-গায়ক সংগ্রহ করিয়া শশিমোহন পল্লী-গানের দল খুলিয়া ফেলিল। মফস্বলের ছেলে, কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিয়াছে, মেসের ছাতের ট্যাঙ্কের উপর বসিয়া দেশীমতে

বগলে পাটা ও পট পল্লী-কবি শশিমোহন মন্থর গতিতে দক্ষিণে চলিয়াছে

ভাটিয়ালি গান গাহিয়া সন্ধ্যার মুখে পাড়ার বাতাস করুণ করিতে করিতে সিগারেট ফোঁকে,—শশিমোহন রিসার্চ করিয়া তাহাদের বাহির করিল। তাহার অনেক আশা, দিগ্বিজয় সবে আরম্ভ হইয়াছে। একজন দুইজন করিয়া পাঁচ-সাতজন জুটিয়া গেল; বেগুনী রঙের গান্ধীটুপি পরাইয়া তাহাদের লইয়া শশিমোহন কলিকাতার সভা-সমিতিতে আক্রমণ আরম্ভ করিল।

তারপর গ্রামোফোন-রেডিও। শশিমোহন মাঝে মাঝে হঠাৎ অন্তর্ধান করে, নিম্নশ্রেণীর দুই-চারজন লোক সঙ্গে করিয়া হাজির হয়, কাহারও হাতে পাঁচ ফুট লম্বা বাঁশের বাঁশী, কেহ বাজায় বিচিত্র আকৃতির বেহালা, কেহ বা শুধু ছেঁড়া পোস্টকার্ড বাজাইয়া তাক লাগাইয়া দেয়। গাধাবোটের মত তাহাদের পিছনে বাঁধিয়া স্টীমাররূপী শশিমোহন বাঁশী বাজাইয়া পথ চলিতে থাকে। কলিকাতা শহর তোলপাড়।

বেশ দিন চলিতেছিল, হঠাৎ শশিমোহন প্রেমে পড়িয়া গেল। গায়িকা পারুলবালার নাম কে না শুনিয়াছে? চেহারায় মূর্তিমতী মৈমনসিংহ-গীতিকা সে, ভঙ্গিতে যেন দেহতত্ত্বের গান। শশিমোহনের একটি পল্লী-গান সে গ্রামোফোনে গাহিবে তাহার অনুমতি চাহিতে আসিয়াছিল। বাবা নাই, মা-ই মালিক। তিনি বলিলেন, তা বাবা, তুমি যদি পারুকে শিখিয়ে দিয়ে আস, আমার অনেক কাজ, ওকে একা তো ছাড়তে পারি না।

আকাশের শশী যেন শশিমোহনের হাতের তেলোর উপর নামিয়া আসিল—কাঁথা, কাঁথা।

শশিমোহন গান শিখাইতে যায়, বৈঠকখানা-ঘরে ছেলেছোকরার ভিড় যেন গিজগিজ করিতেছে। দুইজন যায় চারজন আসে, শশিমোহনের বুক জ্বালা করিতে থাকে। সে অপেক্ষা করে, একে একে কাজ সারিয়া সবাই চলিয়া যায়, শশিমোহন মনে মনে আওড়াইতে থাকে—

"আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর"

পারুলবালার কোনও দিন সময় হয়, কোনও দিন হয় না। শশিমোহন তবু যায়।

এমনই ছয় মাস—শশিমোহন অনেক কথা শোনে। পারুলবালার প্রেমের প্রকোপে আত্মহত্যা করিয়াছে তিনজন, ওয়েটিং লিস্টে এখনও আঠারোজন আছে, শশিমোহন নাইন্‌টিন্‌থ। তাহার বিশ্বাস হয় না, তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে পারুল প্রাইভেট অটোগ্রাফ-বইটা তাহার হাতে দিল কি বলিয়া? অসম্ভব, তাহার তিনখানা কবিতার বই পারুল চামড়ায় বাঁধাইয়া সোনার জলে নাম লিখাইয়া লইয়াছে। মাঝে মাঝে তাহারই কবিতা আওড়ায়, আঠারোজন হইলে এত সময় পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু তারাপদ? মোটর হাঁকাইয়া যখন তখন তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যায়,—সে আর পারুল; সঙ্গে কেউ থাকে না। শশিমোহন নিজের মনকে নিজেই ধমক দেয়, পারুলবালার নামে কবিতা লেখে, চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে।

পারুলবালার মা বলেন, বাবা, তোমার মত একটি জামাই পেলে খুশি হতাম, কিন্তু

পাগল মেয়ে, ওর সময়ই হয় না। বলে—কাজ, কাজ। ছাই কাজ—আদর দিয়ে দিয়ে আমিই ওর মাথাটি খেয়েছি বাবা, তবু তোমরা পাঁচজন আছ।

টেলিফোনের বিলটা বাকি পড়িয়াছিল, তার কাটিয়া দিবে, শশিমোহনের রিসার্চ স্কলারশিপের খানিকটা টাকা খরচ হইয়া যায়। বিনিময়ে রাত্রে একটু মাংসের ঝোল আর খানকয়েক লুচি।

পারুল হাসে, বলে, কাগজ বের করব শশিদাদা, লেখা যোগাড় ক'রে দেবেন?

লেখা? কার চাই? রবীন্দ্রনাথ, দীনেশ সেন, অবনীন্দ্রনাথ?

আর আপনার?

শশিমোহন গলিয়া জল হইয়া যায়, দার্জিলিং হইলে বরফ। কিন্তু শশিমোহনের পয়সা নাই, সেখানে অন্য লোক সঙ্গে যায়। চিঠির জবাব আসে না। মা কলিকাতায় থাকেন, শশিমোহন তাঁহার সঙ্গে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পারুলের গল্প করে।

কিন্তু চাকরি বুঝি আর থাকে না, ভূতপূর্ব প্রধান অমাত্য বিদায় লইয়াছেন, নূতন প্রধান নিযুক্ত হইয়াছেন। তিন বৎসরে শশিমোহন কোনও কাজই দেখাইতে পারে নাই, গানের দল বাঁধিয়াছে, প্রেম করিয়াছে; আয়োজন শুধু কাঁথা আর পটের, সন্ধান করিলে এখনও পাওয়া যায়। শশিমোহনের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। আশ্বাস দিবার কেহ নাই, পারুল দার্জিলিঙে।

শশিমোহন প্রধানের সামনে বড় একটা যায় না; সন্ধান লইয়া জানিল, তিনি কীর্তন-পাগল। রিসার্চ ছাড়িয়া শশিমোহন দীনু মুচির পাড়ায় আড্ডা গাড়িল, খোল বাজাইতে শিখিবে। খোল কাঁধেই একদিন ইউনিভার্সিটিতে উপস্থিত হইয়া বাজাইয়া বাজাইয়া তাক লাগাইয়া দিবে।

কিন্তু ততদিন? শশিমোহন খবর পাইল, প্রধান তাঁহার খোঁজ করিতেছেন। যতদূর সম্ভব করুণ চেহারা লইয়া সে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দিতে যায়। রামহরি পাঠক তাহার চাইতেও চালাক, নিরানব্বই হাজার পুরাতন বাংলা বইয়ের তালিকা সঙ্গে লইয়া ঘোরে, রিসার্চ সম্বন্ধে কেহ কিছু প্রশ্ন করিলে তালিকা খুলিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। প্রধান পর্যন্ত তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করেন না, বটতলার ছাপা পুথিই নাকি তিন আলমারি যোগাড় করিয়াছে! কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই, 'দেখবেন সার্?' বলিয়া আলমারি

খুলিয়া নিত্যকর্মপদ্ধতির ছেঁড়া পাতা বাহির করিয়া দেখায়। তাহার অন্ন কেহ মারিতে পারিবে না।

কিন্তু এমন করিয়া কতদিন চলা যায়? দাড়ি না কামাইয়া চেহারা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, পারুল কলিকাতায় থাকিলে কি মনে করিত! শেষ পর্যন্ত প্রধানের হাতে পড়িতেই হইল। তিনি একটু বাঁকা হাসি হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, এই যে শশিমোহন, তোমার যে দেখাই নেই!

শশিমোহন নিজের হাত দিয়া নিজের কপালের কাছে হাওয়া করিতে করিতে হতাশভাবে বলিল, দাঁড়ান সার্, একটু বসি।

প্রধান অবাক, বলিলেন, ব্যাপার কি শশিমোহন?

শশিমোহন পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া সন্তর্পণে তাহার ভাঁজ খুলিতে লাগিল এবং সেই কাজ শেষ হইবার পূর্বেই আর্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, এই দেখুন সার্, আমি আর বাঁচব না। আমার বুক—। শশিমোহন আর বলিতে পারিল না, তাহার দুই গাল বাহিয়া দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল, এবং হঠাৎ গোঁ-গোঁ করিতে করিতে সে মূর্ছিত হইয়া চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িল।

হুলস্থুল কাণ্ড—জল আন, পাখা আন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এমন কাণ্ড কখনও ঘটে নাই। প্রধান মহাশয় বেকুব বনিয়া গেলেন, শশিমোহনের দেওয়া টুকরা কাগজটার উপর ইত্যবসরে একবার চোখ বুলাইয়া লইলেন, একটা ডাক্তারি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন।

শশিমোহনকে ধরাধরি করিয়া পাণ্ডুলিপি-বিভাগের দপ্তরী ও খাস পিয়ন যখন সদর ট্রাম-রাস্তা পর্যন্ত লইয়া আসিল, ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা মোটরকার হর্ন দিতে দিতে তাহার সামনে আসিয়া থামিল। কাতর চক্ষু মেলিয়া শশিমোহন দেখিল, তারাপদ গাড়ি হাঁকাইতেছে, তাহার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পারুল। দার্জিলিং হইতে কবে আসিল সে? হাতের কাছে বিছানা থাকিলে শশিমোহন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া একবার ঘুমাইয়া পড়িত।

বিস্মিত পারুল বলিয়া উঠিল, এই যে শশিদা, কি ব্যাপার? আপনার কি হয়েছে?

দপ্তরী জবাব দিল, বাবু ভিরমি গেছলেন।

সর্বনাশ! তারাপদ তড়াক করিয়া গাড়ি হইতে নামিল এবং তিনজনে ধরাধরি করিয়া শশিমোহনকে 'ডিকি' সীটে বসাইয়া দিল। শশিমোহন একটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শান্তভাবে বসিয়া রহিল।

তারাপদ ড্রাইভ করিতেছে। সদ্য দার্জিলিং-প্রত্যাগত পারুলের রঙটা কি খুলিয়াছে! গাল ছুঁইলেই ফাটিয়া রক্ত বাহির হইবে, কিন্তু শশিমোহন তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছে না।

পঞ্চাশ মাইল স্পীড, পৃথিবী বনবন করিয়া ঘুরিতেছে। পারুলের রেশমী শাড়ির আঁচলের একটি প্রান্ত শশিমোহনের ঠিক নাকের ডগায় মধুলুব্ধ মৌমাছির মত গুঞ্জন করিতে করিতে উড়িতেছে।

অনন্তের পথে অভিসার। চুলায় যাক রিসার্চ স্কলার্‌শিপ, এ যাত্রা যেন শেষ না হয়!

ভূতুড়ে গল্প

মাংস সিদ্ধ হইতে তখনও বাকি, ক্ষুধার জ্বালায় এক পরিতোষ ছাড়া সকলেই অস্থির। তাহার ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ব্যারাম। পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমাদের কাতর ভাব দেখিয়া সে কৌতুক অনুভব করিতেছিল, অন্য সকলেরই মুখ অপ্রসন্ন। গতিক সুবিধার নহে দেখিয়া আমি সুরেশদাকে বলিলাম রবীন্দ্রনাথ হইতে কিছু আবৃত্তি করিতে। বীরেশ গম্ভীর গলায় হুঙ্কার করিয়া উঠিল, খবরদার, খালি পেটে রবীন্দ্রনাথকে আসরে এনো না বলছি ; কেলেঙ্কারি হবে। যতীন বলিল, তা হ'লে নজরুল ? বীরেশ আর্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, সাবধান, খুন করব। খুন ক'রে ফাঁসি যাব। প্রমোদ বীরেশকে সমর্থন করিয়া বলিল, কাব্য-টাব্য এখন চলবে না বাপু। 'শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্যসম করিতে পান'—এসব কবিতাতেই সাজে। তার চাইতে খানিকটা কাঁচা মাংস আন. চাখা যাক।

বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন শ্যামদাদা। বলিলেন, ভূতের গল্প শুনবি—সত্যিকারের ভূত ? সকলেই 'হাঁ' 'হাঁ' করিয়া উঠিলাম।

ভাদ্রের শেষ। তবুও আকাশে মেঘ থমথম করিতেছিল। বাহিরের অন্ধকারে মেঘরাজ্যের বিপর্যয় চোখে দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু গর্জনে ও বিদ্যুৎঝলকে অনুভব করিতেছিলাম ; রাত্রিটা ভূতের গল্প শুনিবার উপযুক্ত বটে ! ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া সকলেই একটু ঘনিষ্ঠভাবে বসিলাম। শ্যামদাদা বলিতে লাগিলেন,—নামোপাড়ার মাধব ঢাকীকে তো জানিস ? যার খোল বাজানোর ঠেলায় মাঝে মাঝে আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে হয়, সেই। লোক এমনিতে বেশ, কিন্তু কীর্তনানন্দে যখন সে মাতে, তখনই ভাবি, দিই মাথাটা ফাটিয়ে। শেষে ভগবান তাকে শাস্তি দিলেন। লোকটা ভূতের কবলে পড়ল।

রতন একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিয়া উঠিল, কেন শ্যামদা, এই কালও তো দেখলাম, মাধব ঢাকী তার বারান্দায় একা ব'সে খোল বাজাচ্ছে, আর অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

শ্যামদাদা একটু রাগতভাবে বলিলেন, আমি কি বলেছি, সে শিঙে ফুঁকেছে ? ওর ওই মাথা নাড়াটাই তো ভূতের খেলা। কিছুদিন আগে দেখেছিস কেউ ওকে এ ভাবে মাথা নাড়তে ?

মাধব ঢাকীর মাথা লইয়া আমরা ইতিপূর্বে কেহই মাথা ঘামাই নাই। চুপ করিয়া রহিলাম। শ্যামদাদা বলিতে লাগিলেন—

বেশিদিনের কথা নয়। একদিন বিকেলবেলায় নামোপাড়ায় গেছি কিছু গুগলির সন্ধানে। ছিদাম জেলের বাড়ির পরেই মাধব চাকীর আস্তানা। দেখি, ব্যাটা বারান্দায় একা ব'সে খোল বাজাচ্ছে আর গুন গুন ক'রে গান গাইছে। আমাকে দেখেই সে সুর-ভাঁজা ছেড়ে খোলে চাঁটি মারতে মারতে বললে, পেন্নাম হই দাদা-ঠাকুর। নরোত্তম দাস ঠাকুরের একটা পদ নতুন শিখেছি। তোমার কি সময় হবে?

মাধব চাকী তার বারান্দায় একা ব'সে খোল বাজাচ্ছে

মনে মনে রাগ হ'লেও বললাম, একটু চটপট পারিস তো শুনি। হাতে কোন কাজ ছিল না, ভাবলাম, লোকটাকে না হয় একটু খুশিই করা যাক। মিনিট পনরো ধ'রে পাঁয়তারা ভেঁজে মাধব শুরু করলে—

"কাঞ্চন দরপণ বরণ সুগোরা রে
বর বিধু জিনিয়া বয়ান,
দুটি আঁখি নিমিখ, মুরুখ বড় বিধি রে
নাহি দিল অধিক নয়ান।
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর—"

শেষের পদটি সে বার বার ফিরে ফিরে গাইতে লাগল। 'কেনে বা' 'কেনে বা' শুনতে শুনতে মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবলাম, কোনও একটা অছিলায় উঠে যাই। আফিমের মৌতাতে একটু ঝিমও আসছিল। হঠাৎ দেখি, মাধবের তাল কাটছে—পদ

থেমে থেমে যাচ্ছে। একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখি, একটা মাছি বার বার ঘুরে ফিরে মাধবের নাকের ডগায় বসতে যাচ্ছে; মাধব মাথা ঝাঁকিয়ে খোলে চাঁটি মারার ফাঁকে ফাঁকে হাত নেড়ে মাছিটাকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। সেটা বোঁ-বোঁ ক'রে তার মুখের চারিদিকে উড়ে উড়ে আবার ঠিক এসে নাকের ডগায় বসছে। ভারি হাসি পেল আমার। বললাম, মাধব মাছিটা তো ভারি রসিক, কীর্তনের রস ছেড়ে ব্যাটা নড়তে চাইছে না! মাধব এতক্ষণে প্রায় ক্ষেপে উঠেছিল। খোল ছেড়ে সে লাফিয়ে উঠে বললে, দাঁড়া তো শা—, তোর নাকে বসা বার করছি। তারপর রীতিমত একটা কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। ছুটো হাত দিয়ে নাকে চাপড় মারতে মারতে মাধব বারান্দাময় লাফালাফি শুরু ক'রে দিলে। হাসি চাপতে চাপতে আমি তো এদিকে মারা যাই আর কি! শেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর নিজের নাকে এক প্রচণ্ড বিরাশি সিক্কা ওজনের কিল বসিয়ে মাধব মাছিটাকে একেবারে থেঁতলে দিয়ে ধপ ক'রে ব'সে প'ড়ে হাঁপাতে লাগল। সেদিন গান আর জমল না। মাধবের অবস্থাটা স্মরণ ক'রে সারা রাস্তা আপন মনে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে এলাম।

দিন তিনেক পরে, ঘুম থেকে উঠে দাঁতন ভাঙতে চাটুজ্জেদের বাগানে ঢুকতে যাচ্ছি, দেখি, ঝড়ের মত মাধব এসে আমার পা জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। অস্থির ব্যাপার! বললাম, মাধব, পা ছাড়, ব্যাপার কি বল? মাধব কাঁদতে কাঁদতে বললে, দাদাঠাকুর আমাকে বাঁচাও। তুমি না ব্যবস্থা করলে আমি মারা গেলাম। বললাম, ব্যাপারটাই কি বল ছাই? মাধব বললে, মহাপাপ ক'রে ফেলেছি ঠাকুর, বোষ্টম হয়ে জীবহত্যা করেছি। আমার কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে? তার ফলও তো এই ভুগছি।

ভাবলাম, ব্যাটা রাগের মাথায় কাউকে খুন ক'রে থাকবে। সদর-রাস্তার ধারে সে আলোচনা ঠিক হবে না ভেবে বললাম, চল্, চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে সব শোনা যাক। একেবারে কি মেরে ফেলেছিস?

মাধব সাশ্রুনেত্রে বললে, হ্যাঁ, দাদাঠাকুর।

চণ্ডীমণ্ডপে ছুজনে একটু নিরিবিলি বসলাম, চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, লাস সরিয়ে ফেলেছিস তো? লোকটা কে? মাধব নিজের মাথার চুল টানতে টানতে বললে, কি জানি দাদাঠাকুর, হয়তো কোনও বৈষ্ণব মহাজনই কীর্তনের রসে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিলেন। হায় হায়, কি মহাপাতকই করেছি!

বললাম, ভণিতা ছাড়্ মাধব, তার সময় নেই। কাকে মেরেছিস, বল্ না? মাধব চোখ মুছতে মুছতে বললে, তোমার সামনেই তো সেই মহাপাতক করেছি, তুমি তো জান।

মাধবের সেদিনের মাছি-মারা চেহারাটা মনে প'ড়ে গেল, আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বললাম, ওঃ, সেই মাছি মারার কথা বলছিস বুঝি! আমার আবার হাসি পেল। মাধব বললে, উপেক্ষা ক'রো না দাদাঠাকুর, সে মাছি নয়, কোনও মহাজন ছলনা ক'রে মাছিরূপ ধ'রে কীর্তন শুনতে এসেছিলেন—আমি তাঁকে হত্যা করেছি। হায় হায়, আমার কি হবে?

ভাবলাম, মাধব পাগল হয়ে যায় নি তো! বললাম, বৈষ্ণবের পক্ষে জীবহত্যা পাতক বটে, কিন্তু নিতান্ত অনবধানতাবশত যদি এরূপ কাণ্ড বৈষ্ণবের হাতে ঘ'টেই থাকে, তা হ'লে দোষ হয়—এমন কথা তো শাস্ত্রে লেখে না।

মাধব আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, দোষ একটু আধটু নয় দাদাঠাকুর, দোষ হয়েছে চার পোয়া। হায় হায়, হয়তো নরোত্তম দাস ঠাকুরই মাছির বেশে এসে-ছিলেন। আমি নরোত্তম দাসকেই হত্যা করেছি।

ভাল জ্বালায় পড়লাম। বললাম, যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন এ নিয়ে মাথা-খারাপ ক'রে কি হবে? বরঞ্চ একটা প্রাশ্চিত্তি—

মাথা-খারাপ কি আমি সাধে করছি দাদাঠাকুর, তিনি যে আর আমার সঙ্গ ছাড়ছেন না। অপদেবতা হয়ে আমার নাকের ডগায় ভর করেছেন—কেত্তন গাইতে শুরু করলে ঠিক নাকের কাছে উড়তে থাকেন; মাঝে মাঝে নাকের ডগায় বসেনও।

বুঝলাম, পাগলের সঙ্গে কথা বলছি, হাসিও পেল। অনেক রকম ভূতের কথা শুনেছি, কিন্তু মাছিভূত! বললাম, তোমার ও মনের ভ্রম মাধব, সেদিন যে মাছিটা মেরেছিলে, সেটার কথা সব সময়েই ভাব ব'লেই মনে হয় সেটা তোমার নাকের কাছে—

তা নয় দাদাঠাকুর। তাই যদি হবে, তা হ'লে কেত্তন ছাড়া অন্য সময়ে তিনি আসেন না কেন? হায় হায়, আমি কোন্ রসিক মহাজনকে না জানি বধ করেছি!

মাধব কিছুক্ষণ আপনার আবেগে মাথা নেড়ে চুপ ক'রে রইল, তার মুখ চোখ অস্বাভাবিক রকম বিবর্ণ, সত্যিকারের মানুষ খুন করলে লোকের যে রকম অবস্থা হয়, তারও ঠিক সেই অবস্থা। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ-হুমড়ি খেয়ে আমার পা জড়িয়ে ধ'রে মাধব কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, দাদাঠাকুর, আমাকে বাঁচাও, একটা

স্বস্ত্যয়ন-টস্ত্যয়ন কিছু করলে যদি উপায় হয়, পুঁজিপাটা ভেঙে তাই না হয় করছি, এ তো আর সহ্য হয় না।

আমরা অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম। সকলেরই মুখ গম্ভীর ও লম্বা হইয়া আসিয়াছিল, নিমন্ত্রণ-বাড়ির কথা, মাংস সিদ্ধ হওয়ার কথা সকলেই এক রকম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শ্যামদাদা একটু চুপ করিয়া ছিলেন; বীরেশ প্রশ্ন করিল, তারপর?

শ্যামদাদা এক টিপ নস্য লইয়া তুলিতে তুলিতে আবার আরম্ভ করিলেন, সেই থেকেই মাধব পাগল হয়ে আছে। এমনিতে বেশ সহজ মানুষটি, কিন্তু যেই কীর্তন শুরু হয়েছে, অমনই তার সেই অস্বাভাবিক মাথা-ঝাঁকানি আর পাগলের মত নাকের সামনে হাত নাড়া—এ ব্যারাম তার কিছুতেই গেল না। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কত ওষুধ, কত ডাক্তারি করা হ'ল, গিরীন্দ্রশেখর বসু দেখলেন, ডব্লিউ. সি. রায়—কিছুতেই কিছু হ'ল না। সেই মাছিভূত আজও তার নাকে ভর ক'রে আছে। বিজ্ঞান যাই বলুক, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হ'লেও একটা যে কিছু মাধবের ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই, হয়তো সত্যিসত্যিই মাছিভূত—

যতীন বলিল, খুব সম্ভব। এ রকম আর একটা ঘটনার কথা আমরা জানি কিনা।

সকলে সমস্বরে বলিলাম, কি রকম?

ব্যাপারটা ঘটেছিল বর্ধমানে, ভরা বর্ষার মধ্যে আমরা একবার শরৎবাবুর মোটরে চেপে বেড়াতে বেরিয়েছি, বর্ধমান ছেড়ে প্রায় আশি-নব্বই মাইল গিয়েছি, আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে এল—রাত্রিও প্রহরখানেক অতীত হয়ে থাকবে। সেই আঁকাবাঁকা অপরিসর রাস্তায় কাদা আর জলের মধ্যে গাড়ি তো দৈত্যের মত দু চক্ষু পাকিয়ে গোঁ-গোঁ ক'রে ছুটেছে—মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ড্রাইভারকে হুঁশিয়ার হতে ব'লে আমরা যতটুকু পারি ঘনিষ্ঠ হয়ে ব'সে আছি। কারও মুখে কথাটি পর্যন্ত নেই।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ, জনমানব কোথাও নেই—কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে গাড়ি ঘসঘস করতে করতে থেমে গেল। আমরা আতঙ্কে ঘেমে উঠলাম। এই দুর্যোগের রাত্রি, বাঘ-ভালুকের কথা ছেড়েই দিই—যদি ডাকাতে ধরে, তা হ'লেও আর রক্ষা থাকবে না।

বিজু ছিল সঙ্গে,—বললে, দেখ রামবরণ, বোধ হয় তেল নেই—টায়ারগুলো ঠিক আছে কি না দেখ।

রামবরণ টর্চ হাতে সেই বৃষ্টির মধ্যেই নেমে সব দেখে শুনে বললে, টায়ার ঠিক আছে হুজুর, তেলও আছে পাঁচ ইঞ্চি।

তা হ'লে?

কুছ তো সমঝমে নেহি আতাহে বাবু।

তারপর সকলে মিলে প্রাণপণে গাড়িটাকে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম—কিছুতেই কিছু হয় না, মেশিন ঠিক, তেল আছে, অথচ গাড়ি স্টার্ট নেয় না। আমাদের অবস্থা বুঝতে পারছ—সেই অবস্থায় দুর্যোগের মধ্যে ভোরের আলো ফুটে ওঠা পর্যন্ত আমাদের সেইখানেই কাটাতে হ'ল। ভোর হতেই দেখি, অদ্ভুত ব্যাপার!

আমরা উৎসুক হইয়া একটা ভয়ঙ্কর কিছু শুনিবার প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হইলাম। যতীন বলিল, আমাদের ঠিক বিশ হাত আগে একটা নদীর সাঁকো, একেবারে ফাঁক—আগের রাত্রে বন্যাবেগে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সকলকেই স্বীকার করতে হ'ল—গাড়ির ভূত আমাদের রক্ষা করেছে। তখন স্টার্ট দেওয়া হ'ল—কোনও গোলযোগ নেই—সুবোধ বালকের মত গাড়ি স্টার্ট নিলে।

শ্যামদা হাসিলেন, বলিলেন, কি গাড়ি হে?

যতীন বলিল, ফোর্ড।

গল্প শুনিয়া আমরা পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতেছি, এমন সময় খবর আসিল, পাতা প্রস্তুত, আমাদের গা তুলিতে হইবে। মাছিভূত ও গাড়িভূতকে নমস্কার নিবেদন করিয়া আমরা গাত্রোত্থান করিলাম।

ক্রূর কামানল মন্ত্র

ঘটনা অত্যন্ত আকস্মিক—তাহা হউক। পৃথিবীতে আকস্মিক ঘটনাই কিছু কম স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায় না। চট করিয়া দৃষ্টান্ত মনে আসিতেছে না, আপনারা স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করিতে পারেন।

রঙপুরের বাবুলাহাটির জমিদার মৃত বসন্তরঞ্জন চৌধুরীর একমাত্র পুত্র হেমন্ত চৌধুরী কলিকাতায় এম. এ. পড়িতে আসিল। বিধবা মাতা পুত্রকে এই ডাইনীর রাজত্বে একা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন না; সুতরাং কলিকাতায় বাসা ভাড়া লইতে হইল। তাঁহার প্রাত্যহিক গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য শোভাবাজার অঞ্চলে গ্রে স্ট্রীটের উপরে একটি ছোটখাটো পরিপাটী বাড়ি সরকার মহাশয় বন্দোবস্ত করিলেন। মা ও ছেলে, হেমন্তের পিসতুতো এক বোন নলিনী, সরকার হরিহর লাহিড়ী, ঝি, চাকর, দরোয়ান প্রভৃতি মিলিয়া মোটমাট নয় জন; হেমন্ত নাম দিয়াছিল "নবরত্ন"।

কলেজে টাকা জমা দিয়া আসিয়া সিঁড়ি দিয়া তেতলায় নিজের ঘরে উঠিতে যাইবে, ঠিক পাশের বাড়ির চিক-ফেলা দোতলা বারান্দায়, হাত দিয়া অপসারিত চিকের ফাঁকে একটি কচি কৌতূহলী মুখ দেখিয়া হেমন্ত থমকিয়া দাঁড়াইল—নবাগতদের দেখিবার ইচ্ছায় মেয়েটি চিকের বাধা মানিতেছে না।

ব্যাপারটি অত্যন্ত আকস্মিক এবং অকল্পিত। মেয়েটির দৃষ্টি চট করিয়া হেমন্তের দিকে গেল এবং নিমেষমধ্যে হেমন্তের নিস্তরঙ্গ মনে একটা ঢেউ তুলিয়া চিকটি যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল।

মুখখানি অপূর্বলাবণ্যশ্রীমণ্ডিত, চকিত ভয়ে বিস্ফারিত দুইটি চোখ, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম—উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সামাজিক উপন্যাসে যেমন বর্ণনা পাওয়া যায়, ঠিক তেমনটি। হেমন্ত খানিকক্ষণ সিঁড়ির ধাপ হইতে নড়িল না। ঘর গুছাইবার পরিশ্রমের ক্লান্তিতে মা ও নলিনী ঘুমাইতেছেন। প্রখর গ্রীষ্মের পড়ন্ত মধ্যাহ্নে সমস্ত পাড়ায় কেমন একটা নিষুতির ভাব—রহিয়া রহিয়া দ্রুতগামী ট্রামের অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি কানে আসিতেছে।

নিস্তরঙ্গ চিকে আর বিক্ষোভ দেখা গেল না, একটি নাম শুধু কানে আসিল; ভিতর হইতে কে যেন কাহাকে 'সুকল্যাণী' বলিয়া ডাকিল—ডাকনামের পক্ষে বড়, কিন্তু কি অপরূপ নাম!

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আপনারা হেমন্তকে কবি ও ভাবুক ঠাওরাইয়া বসিতেছেন। হেমন্ত ও দুইটার একটাও নয়। সে পলিটিশিয়ান এবং অ্যাথ্‌লেট। প্রাচ্যে চাণক্য এবং প্রতীচ্যে বিস্‌মার্ক তাহার আদর্শ; ভাগ্যদোষে রূপার চামচ মুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাই জীবনে কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিতেছিল না বলিয়া দুঃখিত আছে। তাহার ইচ্ছা ছিল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র 'এডিট' করিয়া বাহির করে—শ্যাম শাস্ত্রী সে কাজ আগেই সারিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাহার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। ফুটবল ও হকিতে উত্তর-বঙ্গে সে অদ্বিতীয় ছিল, টেনিসটায় তেমন জুত করিতে পারিত না। কলিকাতার সাউথ ক্লাবে ঢুকিয়া সে বিষয়েও পারঙ্গম হইবার গোপন মতলব তাহার ছিল। এহেন হেমন্ত ভাবুকতার আবেগে বিহ্বল হইবে না, বাঙালী লেখক হইয়াও এ কথা আমরা জোর গলায় বলিব।

তবে মা কলিকাতা শহরটাকে ডাকিনীর লীলাভূমি কল্পনা করিয়া সর্বদা আতঙ্কিত। কাঁচা দুধের মত ছেলেকে তিনি সকল রকমের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া রাখিতে চান, টকিয়া যাইতে কতক্ষণ! উনানে চাপাইয়া এক বলক উথলাইয়া লইতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। ভিতরে ভিতরে সরকার মশাইয়ের সঙ্গে মিলিয়া তিনি তাহারই চেষ্টা দেখিতেছিলেন। কিন্তু শহরের ডাকিনীরা যে দূর হইতেও মারণমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারে, মফস্বলের বিধবা জমিদার-গৃহিণী তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

হেমন্ত টকিয়া গেল না বটে, কিন্তু তাহার ভাল লাগিল। মুখটা মনে রাখিবার মত—আর একটু কাব্য-ভাবাপন্ন হইলে সে ভাবিত, বুকে রাখিবার মত। তথাপি পলিটিক্স ও টেনিসের ফাঁকে সে চোখ ও কানকে সজাগ রাখিল। নলিনী হইল সহায়।

সংবাদ যাহা সংগৃহীত হইল, তাহা আশাপ্রদ নয়। কবিরাজ রামসদয় মুখোপাধ্যায় দরিদ্র রাঢ়াশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, হেমন্তেরা বারেন্দ্র। নামে কবিরাজি করেন বটে, কিন্তু মোদক বেচেন না বলিয়া উদরান্নের সংস্থান হয় না। সুকল্যাণী তাঁহার কন্যা—দরিদ্র গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে যেমন হয়, বাড়িতে একটু আধটু রামায়ণ মহাভারত পড়ে, তরকারি, রান্নাঘর, ভাঁড়ার এবং ভাইবোনের কাঁথা ও লেপ-বালিশ লইয়া ব্যস্ত থাকে। কলিকাতায় বসিয়া যতদূর 'অর্থডক্স' হওয়া সম্ভব, মুখুজ্জে-পরিবার তাহাই; দ্বিপ্রহরে নিষ্পুরুষ পাড়ায় চিক ফাঁক করিয়া এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে সুখ-দুঃখের কথা হয়, বেপর্দা এই পর্যন্ত। সুতরাং সোজা রাস্তায় সুবিধা হইবে না।

শিকারে হেমন্তের খুব নাম, তাহার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ এবং কোনও শিকার যদি একবার তাহার নজরের ভিতর আসিয়া পড়িত, নিতান্ত বিপর্যয় ছাড়া তাহার আর

পরিত্রাণের উপায় ছিল না। ছলে বলে কৌশলে, যেমন করিয়াই হউক, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যকে ঘায়েল করার শিকারী এবং জমিদারী মনোবৃত্তি তাহার জন্মগত।

দাদার মনোভাবের বিন্দুমাত্র আঁচ না পাইয়াও নলিনী বলিল, স্থকল্যাণী মেয়েটি চমৎকার, সারাদিন কেবল খাটছেই, মুখে রা নেই; সাজসজ্জার বাড়াবাড়ি নেই, অথচ কি রূপ!

এইবারে পলিটিশিয়ান হেমন্তের কূটনীতির পরীক্ষা হইবে। কান্নাকাটি, আবদার আত্মহত্যার ভয় প্রদর্শন অথবা অ্যাব্‌ডাক্‌শন, ইলোপ্‌মেন্ট, লোপাট—কোনটাই হেমন্তের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। এ-পক্ষ ও-পক্ষ কোনও পক্ষই জানিবে না, অথচ কাজ হাঁসিল করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হইলে নলিনীর সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এ পক্ষের বাধা বাধাই নয়, হেমন্তের ইচ্ছাই মায়ের ইচ্ছা, তা সে থাক্ রাঢ়ী-বারেন্দ্র অথবা ধনী-দরিদ্রের ভেদ। ফন্দিবাজ সরকার মশাইয়ের চোখে ধূলা দেওয়া অবশ্য কঠিন। সে বুড়া আবার ময়মনসিংহের কোন্ জমিদার-কন্যাকে আশ্রয় দিবার প্রায় পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া আনিয়াছে।

প্রথম দর্শনেই একটি অজ্ঞাতকুলশীল প্রতিবেশী-কন্যার মুখশ্রীতে ভুলিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিবার প্রবৃত্তির মধ্যে শিকারী মনোবৃত্তি যতখানিই থাক্, পাঠকের বোধ হইতেছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত অসঙ্গত ও অবিশ্বাস্য; এবং একটু আন্‌কন্‌ভেন্‌শনাল যাঁহারা, তাঁহারা বলিবেন, গাঁজাখুরি, তাহা হইলে আমরা নাচার। অবিশ্বাস্য এবং অসঙ্গত বলিয়াই তো গল্প-উপন্যাসের সৃষ্টি; সঙ্গত এবং বিশ্বাস্য ব্যাপার তো অহরহই ঘটিতেছে, তাহা লইয়া কিছু সৃষ্টি করা চলে না। একটা রাক্ষসে হরিণ সাজিল, রামচন্দ্র তাহার পিছনে ছুটিলেন, আর একজন রাক্ষস ভিখারীর বেশে রামচন্দ্রের স্ত্রীকে উড়াইয়া লইয়া গেলেন, রামচন্দ্র বানরদের সাহায্যে সাগর-বন্ধন করিলেন,—এই সকলই তো আপনারা বিশ্বাস করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনে যান; আমার লেখার তেমন কেরামতি থাকিলে, একদিন গ্রে স্ট্রীটে রামসদয় মুখুজ্জের ক্রুর কামানল মন্ত্রের তেজ দেখিতেও আপনাদিগকে যাইতে হইবে। তখন আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা উঠিবে না।

ম্যাজিক এবং পলিটিক্স—উভয় শিল্পকলাতেই একজন অ্যাসিস্টাণ্ট প্রয়োজন। পলিটিশিয়ান হেমন্ত উৎপলের সাহায্য গ্রহণ করিল। সে তখন কলিকাতায় ম্যাজিক ও ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম দেখাইয়া ছাত্রমহলে নাম কিনিয়াছে, এবং ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে অভিনয়ে সাফল্য লাভ করিয়া নাট্যমন্দিরে ঘোরাঘুরি করিতেছে। উৎপলও স্পোর্টস্‌ম্যান,

সে বিনা দ্বিধায় হেমন্তের সাহায্যে অগ্রসর হইল। এই গেল আমাদের নাটকের মুখবন্ধ। ইহার পর আর কয়েকটি দৃশ্যে ইহার সমাপ্তি। চরিত্র-পরিচয় মুখবন্ধেই দিয়াছি।

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিয়া উৎপল লাফাইয়া উঠিল, বিস্মিতও কম হইল না, কারণ হেমন্তের পক্ষে প্রেমোন্মাদ হওয়া—তথাপি স্পোর্ট ইজ স্পোর্ট। চট করিয়া কাগজ পেন্সিল লইয়া হিসাব করিয়া সে বলিল, পাঁচ টাকা সাড়ে দশ আনা—এ টেনার উইল ড়্, বের কর। হেমন্ত দশ টাকার নোট বাহির করিল। ঘণ্টাখানেক পরামর্শ চলিল।

পরদিন প্রাতঃকালে রামসদয় কবিরাজের বৈঠকখানায় তীক্ষ্ণনাসা সৌম্যদর্শন এক অবধূত সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল—ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসাকাতর সন্ন্যাসী প্রবেশ করিয়া এক ঘটি পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন, সঙ্গে এক মুষ্টি আতপ চাউল। ছেলেমেয়েরা ভিড় করিয়া উঠানের বারান্দায় দাঁড়াইল; কবিরাজ-গৃহিণী উঁকিঝুঁকি মারিলেন। চাউল চিবাইয়া জল পান করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, পরম পরিতৃপ্ত হলাম বাবা। কিন্তু সময় তো তোমার ভাল যাচ্ছে না। রামসদয় প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, সবই তো জানতে পারছেন ঠাকুর। অচল হয়ে এসেছে।

সন্ন্যাসী হাসিলেন, দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

ভিতরের দরজা বন্ধ হইল। এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে তাকে সারি সারি সজ্জিত বিচিত্র নামাঙ্কিত ঔষধের বোতলগুলির দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, ওই মকরধ্বজই খানিকটা দাও, ওতেই হবে। দরিদ্র কবিরাজ, স্বয়ং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে পারেন না; পটাসিয়াম পার্‌মাঙ্গানেটের মত দানাদার 'মার্কে'র মকরধ্বজ খানিকটা বোতল হইতে বাহির করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার হাতে দাও। এইবার ধর।

বারোখানি চকচকে নূতন গিনি রামসদয় কবিরাজের মুঠার মধ্যে আসিতেই তাঁহার হাতটা অসহ্য দাহে জ্বালা করিতে লাগিল, বুকটা গুরগুর করিয়া উঠিল। বিস্ময়ে ভয়ে অপলক গোল-আলুর মত ড্যাবা-ড্যাবা চোখ দুইটিতে লোভে ও অবসাদে জল দেখা দিল। অকস্মাৎ গিনিগুলা ফরাশের উপর ছড়াইয়া দিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী অভয় দিলেন। বলিলেন, গিনিগুলো রাখ, ওতেই কদিন চলবে। কিন্তু এ ব্যবসা তোমাকে ছাড়তে হবে।

আপনার আদেশ—

অধীর হ'য়ো না বৎস, সব বলছি।

সাত দিনের মধ্যেই দেখা গেল, কবিরাজির পুরাতন জীর্ণ সাইন্‌বোর্ড অপসারিত এবং তাহার স্থলে চকচকে পিত্তল-ফলকে ও সজ্জাঙ্কিত কাষ্ঠ-ফলকে অবধূত রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের নাম ও বশীকরণ, মারণ, উচাটন ইত্যাদির বিজ্ঞাপন। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অক্ষরে "ক্রূর কামানল মন্ত্র" জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

প্রায় ভোরের দিকে হেমন্ত এদিক ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া অবধূত রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। ভালমানুষ রামসদয় চিনি চিনি করিয়াও ছোকরাকে চিনিতে পারিলেন না। জাল-জুয়াচুরি জীবনে কখনও করেন নাই, নিতান্ত সরল বিশ্বাসে সন্ন্যাসীর কথামত কাজ করিতেছেন; উৎপলের ম্যাজিক এবং হেমন্তের জমিদারি তাঁহার অভাব ঘুচাইতেছে; কিন্তু তিনি জানেন, ইহা অবধূত সন্ন্যাসীর কৃপা, সুতরাং এখনও মন্ত্র-বিক্রয়ের কায়দাকানুনগুলা তেমন রপ্ত হয় নাই। থতমত খাইয়া প্রশ্ন করিলেন, কি চাই বাবা?

হেমন্তের লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু নাচিতে নামিয়া ঘোমটা দিলে চলিবে কেন? মাথা নীচু করিয়া প্রায় মরিয়া হইয়া বলিল, ক্রূর কামানল মন্ত্র চাই প্রভু। হেমন্ত কবিরাজ মহাশয়ের পা ধরিল।

লক্ষ্য?

একটি বালিকা।

নাম গোত্র জানা আছে?

আছে।

বিবাহ, না—?

আজ্ঞে, ধর্ম-বিবাহ।

এক শত আট টাকায় কন্‌ট্রাক্ট হইল, বিফল হইলে মূল্য ফেরত। যজ্ঞ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে, এবং লক্ষ্যের নাম ধাম গোত্র একটি ভূর্জপত্রে লিখিয়া মাদুলির মধ্যে ধারণ করিলেই মন্ত্র অমোঘ ফল দিবে। প্রৌঢ় রামসদয় উৎপলের ম্যাজিকে অত্যধিক বিশ্বাসী হইয়াছিলেন বলিয়াই এতখানি অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন। তাঁহার মনের মধ্যে কোনও পাপ ছিল না।

বাড়ি ফিরিয়া হেমন্ত একবার বুক ফুলাইয়া ওই বাড়ির দিকে চাহিল—হাসিতে পাইলে ভাল হইত; হাসি চাপিতে গিয়া হঠাৎ চোখ মারিয়া বসিল। সুকল্যাণী ছাদে ঘুঁটে তুলিতেছিল। সর্বনাশ! হেমন্তের বুক ভয়ে হিম হইয়া আসিতেছে। এ কি করিল সে?

যদি সুকল্যাণী হাসে, অথবা পাল্টা চোখ মারে, তাহা হইলেই তো সব পণ্ড। এই ব্যাপারের যবনিকা এখানেই ফেলিতে হইবে; চোখ-মারা এবং ফিরিয়া-হাসা মেয়েকে আর যাই করা যাক—বিবাহ করা চলিবে না। ভগবান রক্ষা করিলেন, সুকল্যাণী ঘুঁটে ফেলিয়া ত্রস্ত পদে নীচে পলাইল। হেমন্তের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। না, সিলেক্‌শনে তাহার ভুল হয় নাই। সে ভারি আরাম পাইল।

যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। দরজা জানালা বন্ধ। গরদের থান পরিয়া শুভ্রপৈতাধারী হেমন্তের কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, বল বাবা।

হেমন্ত বলিল—

চক্রসংস্থানরূপাখ্যা বারাহী হৃদিভূষণঃ।
শূন্যতাকরুণাদ্বৈত্যা মারণং ন চ মারণম্॥
সপ্তত্রিংশতি যোগিন্যরেকৈকস্য তৎ সংযুতং।
সর্বডাকিনী তৎখ্যাতা অন্যা চৈব মহদ্ভূতা॥
তাশ্চ সর্বা যথা ভূমি নামোদ্দেশা মহার্ণবে।
শষকী ক্ষীরিকা স্নিগ্ধা মধুরা সর্বকামদা॥

লেখ বাবা, নাম ধাম গোত্র—

হেমন্ত লিখিল। শ্রীমতী সুকল্যাণী মুখোপাধ্যায়, —নং গ্রে স্ট্রীট, ভরদ্বাজ গোত্র। মুড়িয়া কবিরাজ মহাশয়ের হাতে দিতেই তিনি মাদুলিতে পুরিতে পুরিতে বলিলেন, বল—

দ্বাবিংশাক্ষরং হৃদয়ং ডাকিন্যা সহ সম্পুটং।
ওঁ শ্রীং ওঁ বং বজ্র হেড়া হেকি রূণীরূপে কং হুং ডাহুং কি
ফণীট জাট্ লট্ সংস্বাভ হার হুং হুং ফট্ স্বাহা॥

হাসি চাপিয়া রাখা কঠিন হইতেছে। হেমন্ত তথাপি উচ্চারণ করিল। যজ্ঞশেষে এক শত টাকা প্রণামী দিয়া হেমন্ত বিদায় হইল।

আরও দশ দিন পরে ক্রুদ্ধ হেমন্ত রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিতেছে, জোচ্চুরির আর জায়গা পান নি মশাই? নালিশ করব আমি।

রামসদয় কবিরাজ এত সব ভাবেন নাই। অবধূত সন্ন্যাসী তাঁহার ভরসা, বলিলেন, অসম্ভব বাবা, এ হতেই হবে। তোমার ভুল হচ্ছে না তো?

দেখুন, ও চালাকিতে আমি ভুলছি না।

কবিরাজ মহাশয় ফাঁপরে পড়িলেন। এ কি ফ্যাসাদ! তিনি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, মনে মনে গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

"হর হর ব্যোম ব্যোম" ধ্বনির সঙ্গে দরজায় করাঘাত হইতে লাগিল। "জয় গুরু" বলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কবিরাজ মহাশয় দরজা খুলিতেই অবধূত সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল।

সমস্ত শুনিয়া অবধূত বলিলেন, দেখি মাদুলি। হেমন্ত প্রস্তুত হইয়াই ছিল, উৎপলের হাতে মাদুলিটা দিল। ভূর্জপত্র বাহির হইল। অবধূত চমকাইলেন। হেমন্তকে বলিলেন, তুমি একটু বাইরে যাও তো বাবা। হেমন্ত বাহির হইয়া গেল।

বিমূঢ় রামসদয় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, অসম্ভব গুরুদেব, তা কেমন ক'রে হয়?

হতেই হবে বৎস, নইলে ব্যাবসা ছাড়তে হয়, হয়তো মামলা-মকদ্দমা—

রামসদয় কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, এখন উপায়?

অবধূত বলিলেন, তোমার মেয়ে ব'লেই মন্ত্রে কাজ হয় নি, নইলে ও এতক্ষণ ছুটে বেরিয়ে যেত।

সামাজিক গোলযোগ—

অবধূতের সমাজ নেই বৎস।

* * * *

সুকল্যাণী মুখ নীচু করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, ও আমি আগেই জানতাম। যে তোমার চাউনি! কিন্তু তুমি কাজটা ভাল কর নি। আমার বুড়ো বাবাকে নিয়ে—উনি যদি জানতে পারেন কখনও?

তুমি পাগল হয়েছে সুকু! আমি পাশের বাড়িতে থাকি, আমাকেই চিনতে পারেন নি, প্লেন উৎপলকে কখনও উনি চিনতে পারবেন না। উৎপল কিন্তু ফাঁটা বড় জোর হেঁকেছে।

প্রশ্ন করা উচিত হইবে কি না, সুকল্যাণী বুঝিতে পারিল না; তথাপি ছোট্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

"ক্রুর কামানল মন্ত্র" নিয়ে একটা নাটক লিখেছে, সেটা ছাপিয়ে দিতে হবে—নাট্য-মন্দিরে অভিনয় করবে।

নলিনী বলিল, দাদার ধরনই এই, কিন্তু তুই কি বল্ দেখি, যদি কবিরাজ মশাই রাজী না হতেন?

তা কি হতে পারে ঠাকুরঝি, ও যে জন্ম থেকেই লেখা আছে।

তা হ'লে মন্ত্রটা?

সত্যি।

মা কোনও দিনই ছেলের হদিস পান নাই, এবারেও পাইলেন না। সমস্ত ব্যাপারটা কিছুতেই তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে আনিতে না পারিয়াও তিনি বিরক্ত হইতে পারিলেন না। বউয়ের মুখখানি তাঁহার ভারি পছন্দ হইয়াছিল, যাহাকে বলে লক্ষ্মীমন্ত—সুকল্যাণীর সমস্ত লক্ষণ ছিল তাহাই। ডাইনী কিছুতেই বলা চলে না। তিনি শুধু নলিনীকে ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি বল্ তো নলি? হেমা এমন বাঁ্যাকা পথে গেল কেন? সোজাসুজি বললেই—

নলিনী বলিল, তুমি ক্ষেপেছ মামীমা, তা হ'লে কি দাদা কোনও কালে বিয়ে করত? ভাগ্যিস এই রকমটা হ'ল!

কি জানি বাপু!—বলিয়া মা আর একবার নববধূর মুখখানি দেখিতে গেলেন। বেহাইয়ের লাঞ্ছনা তাঁহার হইয়া ছেলেই করিয়াছে—এইজন্য অনুতাপ তাঁহার কোনও দিন যায় নাই। সরকার মহাশয় আজকালকার ছেলেদের একদম বিশ্বাস করিতেন না, তিনি মোটেই অবাক হইলেন না।

গুরু অবধূত সন্ন্যাসী অদৃশ্য। কবিরাজির পুরাতন সাইন্‌বোর্ডটা আবার যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় আজকাল বাড়িতেই স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতেছেন।

কৃষ্টি-সন্ধানে

শান্তিনিকেতন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রতচারী সংঘ—বাংলার প্রাচীন এবং আধুনিক কৃষ্টি সংকৃষ্টি, সংস্কৃতি, চর্যা এবং কাল্‌চার, এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আবিষ্কৃত, গঠিত এবং ক্রমশ প্রকাশিত হইতেছে। পুথির পাটা, পট, পিঁড়ি, হাঁড়ি, ভাঁড়, আড়া, কুনকে, কাঠা প্রভৃতির মধ্যে যে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের এতগুলি অধ্যায় গুপ্ত ছিল, তাহা কে জানিত! ভদ্র বাড়িতে বেড়াইতে গিয়া গ্লাস-কেসে মাটির পুতুল, কাঠের আহ্লাদী পুতুল, দেওয়ালে কালীঘাটের পট এবং টেবিল-টিপয়ে বড় হইতে ক্ষুদে কাঠার ক্রমবিকাশ দেখিয়া অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠে।

গাঁজার কল্কের ক্রমবিকাশ এখনও দেখি নাই, কিন্তু অচিরে দেখিব আশা করিতেছি। সুতরাং পাটা ও পট সংগ্রহে বাহির হইলাম।

মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াই। গ্রামের গৃহস্থের সদর খিড়কি বুঝিবার জো নাই, অজ্ঞাতসারে খিড়কি-পথে ঢুকিতে গিয়া তাড়া খাই, গৃহস্থ-বধূর বিস্মিত আতঙ্কিত দৃষ্টি এবং গৃহকর্তার তাড়া—অর্থগৃধ্নু বুদ্ধিমান ফ'ড়ের হাতে ঠকিতেও হয়; আলে আলে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া অড়হর বা আখের ঝাড়ের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়ি। দিন মন্দ কাটে না। মাসে মাসে রিসার্চ স্কলার্‌শিপ, খরচ যৎসামান্য।

সেদিন সারা দ্বিপ্রহর ঘুরিতে ঘুরিতে একটা পুরাতন খোলামকুচিও জোটে নাই। মুসলমানপ্রধান গ্রাম, পুরাতন 'ছোলতান' ও 'মোহাম্মদী'র ছেঁড়া পাতা, 'ভেলুয়া সুন্দরী'র কেচ্ছা—মনটা ভারি খারাপ ছিল; ক্ষেতে খামারে একটু ছায়া পর্যন্ত নাই। শেষে হতাশ হইয়া পীরু মিঞার পিঁয়াজের ক্ষেতে খোলা ছাতাটা দিয়া রৌদ্র আড়াল করিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

*   *   *   *

প্রচণ্ড কোলাহলে ঘুম ভাঙিয়া গেল, চমকিয়া জাগিয়া উঠিতেই দেখি, কোথায় সুলতানগঞ্জ, আর কোথায় বা পীরু মিঞার পিঁয়াজের ক্ষেত। জনাকীর্ণ শহরের পথ, পথের দুই ধারে স্ত্রী-পুরুষের ভীষণ ভিড়—দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া কোলাহল করিতেছে; আর তাজ্জব ব্যাপার রাস্তার ঠিক মাঝখানে পিঁয়াজের কলি নয়, বড় বড় ঘোড়া-পিঁয়াজ সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে এবং রাত্রির অন্ধকারকে উপহাস করিয়া তুবড়ির মত আকাশে অ্যালুমিনিয়মের তারাবাজি ছুটাইতেছে। আলো আর তারা আর স্ফুলিঙ্গ—শেষই হইতে

চায় না। তুবড়িবাজি যত চলিতে থাকে, লোকের উৎসাহ ও চীৎকার যেন ততই বাড়িয়া যায়। অবাক কাণ্ড, সামান্য পিঁয়াজের মধ্যে যে এত লীলা নিহিত ছিল, কে জানিত! কিন্তু ব্যাপারখানা কি? ছিলাম সুলতানগঞ্জের শ্মশানধারের ক্ষেতে, এ আমি আসিলাম কোথায়? পিঁয়াজ-তুবড়ি-মুগ্ধ এ লোকগুলাই বা কে? ঘটি দুই জল ছাড়া তো কিছু খাই নাই! এখানকার জলেও কি তবে—

ইয়া তাজ্জব! জল সম্বন্ধে ভাবিতে গিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম, ফিরিয়া চাহিতেই দেখি, কোথায় পিঁয়াজ-তুবড়ি, কোথায় জনতা। আমি কলিকাতা শহরের ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আছি। সম্মুখেই আমাদের সেই চিরপরিচিত বিশ্ববাণী-মন্দির। সেই ইলেক্‌ট্রিক তারের পোস্ট, সেই বাস-স্টপ; গাছগুলাও আছে; কিন্তু তবু কেমন নূতন নূতন ঠেকিল। সিঁড়ির ধারে একটা বেদীর উপর দাঁড়াইয়া আলখাল্লা-পরিহিত কে একজন হাত পা ছুঁড়িয়া তারস্বরে বক্তৃতা জুড়িয়া দিয়াছেন, উল্টা গাধায় চড়িয়া একজন তরুণ শিল্পী, যেন
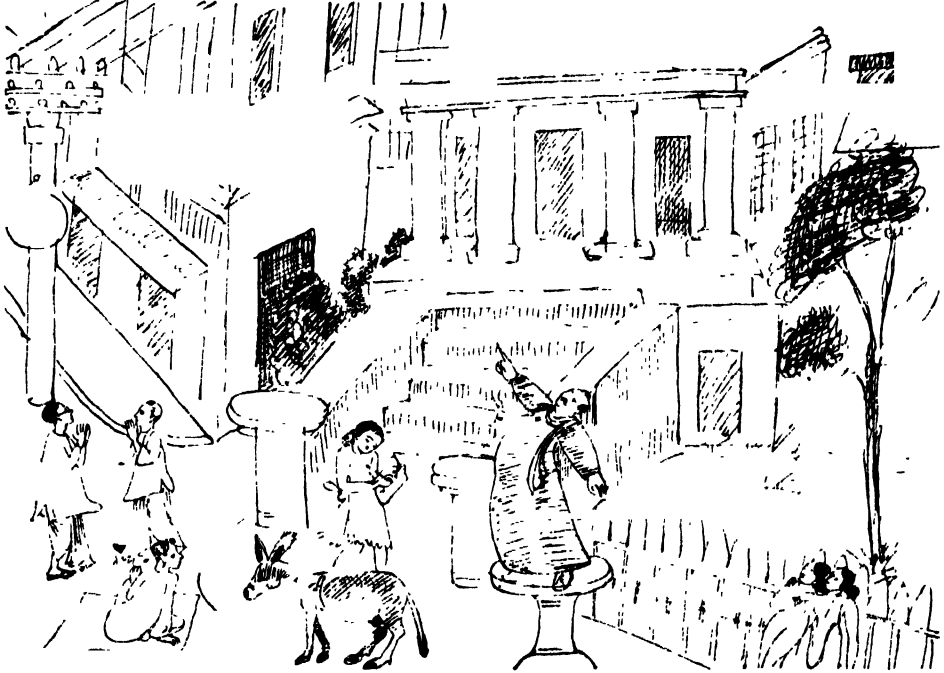
যেন অজন্তা গুহা হইতে পদব্রজে

অজন্তা গুহা হইতে পদব্রজে আসিয়া, ছবি আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছে। এধারে ওধারে "রুচিসংসদ"-মার্কা তরুণ-তরুণীরা—

শুনিয়াছি, গভীর অরণ্যে অজগরের দৃষ্টি চোখের উপর পড়িলে হরিণেরা এমনই মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে, মৃত্যু আসন্ন—ইহা মনে মনে অনুভব করিয়াও পলাইতে পারে না, ধীরে ধীরে সেই দৃষ্টিমোহে বিভ্রান্ত হইয়া অজগর-কবলে প্রাণত্যাগ করে। আমাদের দৃষ্টিবিনিময় হয় নাই, কিন্তু বক্তৃতা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল, আমি মন্ত্রচালিতের মত আগাইয়া গেলাম, রাস্তা পার হইয়া বক্তার সম্মুখে আসিতেই তিনি একবার আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—এতক্ষণ তাঁহার স্বরই শুধু কানে আসিতেছিল, এইবার ভাষাও বুঝিতে পারিলাম—

"তাই বলিতেছিলাম রঙ, রঙমশাল নয়, রঙ-তামাশা নয়, রঙ সাইডও নয়, রাইট অ্যাণ্ড রঙ। স্বর্গগত মহাপুরুষ বলিতেন, মাইট ইজ রাইট। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আমি বলি, মাইট ইজ রঙ। তাই চাই দেওয়ালে দেওয়ালে রঙ। চোখের রঙ দেওয়ালে লাগুক। হোরি খেলত নন্দলালা—

"আকাশে নীল, অরণ্যে সবুজ কে লেপিয়া দিল? জল কে সৃষ্টি করিয়াছে? তেল দেয় কে? জলে রঙ গোলো, তেলে রঙ মেশাও। তেল দিয়া তেল-রঙা ছবি আঁকিয়াছে, দেখিতে চাও? ভাই সব, ভিতরে আইস। এবার তেল দিয়া দেওয়ালে দেওয়ালে জল-রঙ লেপিতেছে। তেলে জলে কেমন মিশ খাইয়াছে দেখিয়া যাও।"

বক্তা বেদী হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে চলিলেন। হ্যামেলিনের বংশীবাদকের পিছনে ইঁদুরছানার মত আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। ভিতরে গিয়া দেখিলাম, ছোট বড় লম্বা চ্যাপ্টা গোল দামী দামী ফ্রেমে আঁটা ভাঁড় ভাঁড় তেল, সর্বত্র তেল চুয়াইয়া পড়িতেছে; পাইপে, ট্যাঙ্কে, চৌবাচ্চায়, কুঁজায়, গেলাসে জল ছিল, তেল হইয়া আসিতেছে। উল্টা-গাধায়-চড়া অজন্তাগুহা-মার্কা সেই ছেলেটি এক পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল, দেখিলাম, তাহার গাল বাহিয়া তেল পড়িতেছে।

প্রদর্শক মহাশয় এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিতে থাকেন, আমি তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরি, ঘরে ঘরে ভাঁড় ভাঁড় তেল দেখিয়া বেড়াই। এক জায়গায় দেখিতে দেখিতে নাক চুলকাইতে লাগিল। নাকে নস্য লওয়া অভ্যাস ছিল, এক টিপ নস্য লইয়া নাকে দিতে যাইব, হঠাৎ মাঝপথে হাতটা মুখে ঠেকিল। সর্বনাশ! মুখটা এত লম্বা হইয়া গেল কি করিয়া? হাত দিয়া মুখটা ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে চোখে তেল আসিল, সে কি তেল-কান্না! কান দুইটাও লম্বা হইয়া গিয়াছে। উর্দিপরা চাপরাসী দরজার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে।

এ কি করিলে ভগবান! মুখটা আয়নায় দেখিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তাহার উপায় নাই। কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে আয়না কিংবা চকচকে মসৃণ কিছু কোনখানে রাখেন নাই, পাছে কেহ মুখ দেখিয়া ফেলে! চারদিকে ছাতা-পড়া দেওয়াল এবং ঘষা কাচ। সকলে নিশ্চিন্ত মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু আমি আর থাকিতে পারিলাম না, তেলের ভিতর নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে চেষ্টা করিলাম এবং আর্ত কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিবার পথ খুঁজিতে লাগিলাম।
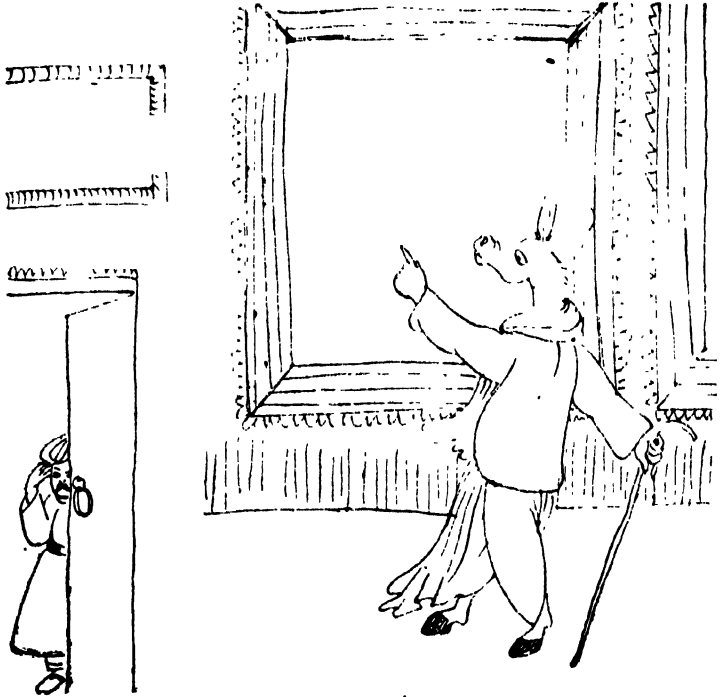
সর্বনাশ! মুখটা এত লম্বা হইয়া গেল কি করিয়া?

সে পথেও ভিড়, দীর্ঘমুখ, লম্বাকান আমার মত হতভাগ্যেরা পরস্পর ঠোকাঠুকি করিয়া বাহির হইতেছে। দীর্ঘজীবনযাত্রার কি ভরসা এবং সম্বল লইয়াই না তাহারা ফিরিতেছে! পথে তৃণগুল্ম আর কণ্টক, দীর্ঘ পথ বহিবার জন্য ভার ভার বোঝা। বিচক্ষণ কর্তৃপক্ষ তাহাদের একেবারে প্রস্তুত করিয়াই ছাড়িতেছেন।

তখনও আমার কান্না থামে নাই, তবু ভয়ে এবং ভক্তিতে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিলাম, প্রবেশকারীরা বহির্গামীদের দেখিতেছে না তাই রক্ষা; জল ঢুকিয়া তেল বাহির হইতেছে।

যাহারা বাহিরে আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে হঠাৎ কে একজন তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—করুণ আর্ত চীৎকার!

গাধার ডাকে ঘুম ভাঙিতেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। পীরুর পিঁয়াজ-ক্ষেতের যেখানটায় আমি শুইয়া ছিলাম, সেখান হইতে সুলতানগঞ্জের
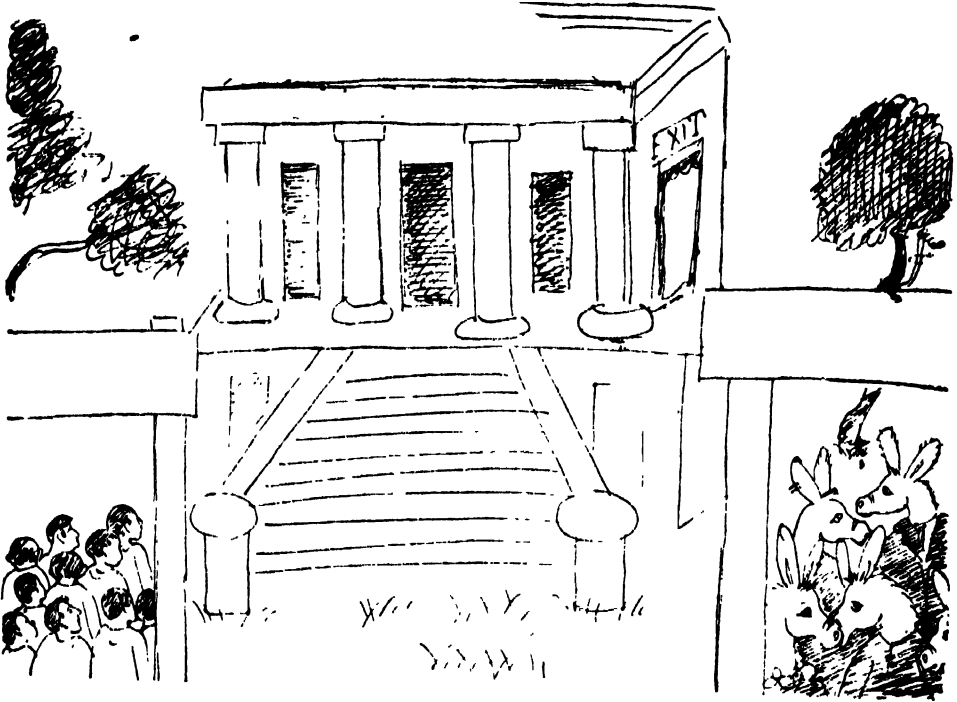
একবারে প্রস্তুত করিয়া ছাড়িতেছেন

পার্শ্ববাহিনী জলাঙ্গীর জলরেখা দেখিতে পাইতেছিলাম। অস্তগামী সূর্যের রক্ত-রাঙা কিরণপাতে নদীবক্ষ তখন ঈষৎ আরক্ত হইয়া কাঁপিতেছে, দূরের বনভূমি প্রদোষ-সন্ধ্যায় ধূসর হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত শ্মশানভূমি বালুদেহ লইয়া একটা মৃত অতিকায় দৈত্যের মত পড়িয়া আছে। মনটা হঠাৎ কেমন বিষাদাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

দিনটা বিফলে গেল কি? শ্মশানের ঠিক মাঝখানে দুইটা ভাঁড় আর একটা ভাঙা কলসী পড়িয়া ছিল, কিন্তু সেদিন সেগুলি সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইল না। পল্লীর শ্মশানভূমির যাহা শোভা, শহরে যাদুঘরে তাহাকে টানিয়া আনিয়া লাঞ্ছনা করিবার অধিকার আমাকে কে দিল? কৃষ্টি? নাই বা হইল।

কুলেণ্ডা

রসের সমুদ্রের ওপর ব'সে আছি, জান? দিগন্তে নভস্কোসিয়া পক্ষী—উলুম্বীক পুষ্পের ঘ্রাণ। ফেরিক্রাম নীল আকাশে বিন্দু বিন্দু তুম্বে্রাকীন—দেখছি আর মনটা পিক্রচুকের মত উদাস হয়ে যাচ্ছে।

লরেন্স, হাক্সলী, এলিয়ট—পাউণ্ড, স্পেণ্ডার, অডেন, জয়েস—চিঙ্কেচাণ্টো যুগের এম্পারাণ্টো ভাষা—তোমার মুখের আঘ্রাণে সেই ভাষার স্পর্শ পাচ্ছি; মনে পড়ছে

মনটা পিক্রচুকের মত উদাস হয়ে যাচ্ছে

পেপিলাউ অরণ্যের কথা, যেখানে দিনরাত্তির তেত্তিলো পাখী ব'সে থাকে আর মুখে মুখ ঘষে, গান গায় না; ওম্ব্রাবেন গিরিকন্দরে এরিথ্রাম বাঁশে ধুতুং বাঁশি বাজে।

তুমি কি কথা বলবে? জুগোলাভের কথা—এক শো আট বার তোমার মুখ থেকে শুনেছি, তবু নতুন লাগে,—সেই যেখানে এণ্ডিকন স্টুপেণ্ডাকে বুকের গুগাছি লোম ছিঁড়ে দিয়ে বললে, ধনুকের ছিলে ক'রে দাও, আর স্টুপেণ্ডা পেলিওসিন হাসি হাসলে।

সে হাসি স্টুপেণ্ডার নয়, আমার মর্মের ঠিক ইপিফিকাসে সেই হাসির লহর আঘাত

করছে—তোমার গল্প বানানো, স্টুপেণ্ডা তুমি নিজে—সে কি আর আমি বুঝি না? তবু শুনি তোমার গল্প।

অদ্ভুত তোমার কথা বলবার ভঙ্গি—ব্যাভরিলোর নরম নিখাদে কে যেন আপেক্স বুলিয়ে যায়—সমস্ত বুকটা থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে আলাস্কার উষর ভ্যাসেরার মত, মনে হয়, হ্যাকেল্‌ডিউ হয়ে উবে যাই।

কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, পাল্টে গল্প বলতে আমিও জানি। তাই বলছি শোন, অনাদৃত কুলেণ্ডার গল্প, অথচ যার চোখের আগুনে সমগ্র কুচলাও-বংশ দেখতে দেখতে ধ্বংস হয়ে গেল।

খুব বেশি দিনের কথা নয়—তখন সবে এপিকাস উলাঙ জয় ক'রে ফিরেছে। সারা পথ এবিওস্‌বারা ভারে ভারে উপঢৌকন নিয়ে সঙ্গে আসছে তার—

হঠাৎ তোবাতিনোর মরুময় প্রান্তরে চাঁদের মত স্বর্ণাভ সূর্য অস্ত গেল, থুঙকার মত থমথম করতে লাগল সারা পৃথিবী। স্কেপুলারা এখনই আসবে বেরিয়ে, শুরু হবে তাদের দীর্ঘ রজনীব্যাপী লাইলাসিন। দুশ্চিন্তায় এপিকাসের মুখে অ্যাল্‌থ্রিয়পের সিদ্ধ মাংসও রুচল না। ধনুকের ছিলায় মাথা রেখে হার্পিজের মত অন্ধকার দিগন্তে চেয়ে ব'সে রইল এপিকাস।

মাঝরাতে এল কুলেণ্ডা—নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, মাথায় টানা হিবিস্‌কাসের গুণ্ঠন একটু সরিয়ে দিয়ে খুজলি হাসি হেসে বললে, আমি কুলেণ্ডা। কিন্তু তোমরা এখানে কেন? পালাও এখ্‌খুনি।

উলাঙ-জয়ী এপিকাস চমকে উঠল, বললে, তুমি—তুমি কুলেণ্ডা? আমি যে তোমাকেই খুঁজতে বের হয়েছি কুলেণ্ডা। কত দীর্ঘ দিন, কত দীর্ঘ দামুনি তোমার নামাঙ্কিত নিশ্বাস ফেলে ফেলে পাহাড় পর্বত নদী প্রান্তর বিদস উবিদসে ওয়াসারুর মত ছুটেছি। শেষে কিনা—

কুলেণ্ডা কথা বললে না, ঠোঁটে হাত রেখে শুধু দূরের টিনচুরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে দেখালে।

সেখানে কুণ্ডে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় টলমল করছে রাত্রির অন্ধকার; স্কেপুলাদের উৎসব চলছে। ভেসে আসছে গান—

দিয়াবো দিমুনে তিরো মসমাই।

ধনুকে হাত দিলে এপিকাস।

কুলেণ্ডার নরম হাত—আয়োলির চাইতেও লঘু। কুলেণ্ডা বললে, পালাও তুমি।

আর তুমি ?

উর্ধ্বে হাত তুলে দেখালে কুলেগুা।

* * *

যেখানে এসে তারা থামল, সেখানটায় ঘনসন্নিবিষ্ট খেজুর আর জাম গাছের আড়ালে সৃষ্টি হয়েছে নিকুঞ্জবন। তখনও হাঁপাচ্ছিল দুজনে। এপিকাস ডাকলে, কুল—কুলেগুা! কুলেগুা ছোট্ট ক'রে জবাব দিলে, কি ?

মনে পড়ে সেই দিদিরো বনের মাঝখানে হ্যাক্‌লাউ গাছের তলায় খরগোশের ছানাটি ধরতে গিয়ে তুমি হোঁচট খেলে! আর আমি—

কুলেগুা হাত চাপা দিলে এপিকাসের মুখে, বললে, যাঃ।

এই নিতান্ত প্রাকৃত ভাষাতে সিনাই পাহাড়ে মিনার্ভা চঞ্চল হলেন।

কিন্তু ছি, আমি এত ব'কে মরছি কেন? কুলেগুা কে, এখনও যদি না বুঝে থাক, তবে নাই বা বললাম আমার গল্প! তার চাইতে উরুগেয়ার প্যারাগয় হ্রদের ধারে হুদোলোর স্বপ্ন দেখা যে ঢের ভাল। অতএব বিদায়।